58
সাহিত্য বীথি

Approved by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book of Class VI Bengali, Vide Notification No. TB/76/VI/TB/25, dated 17. 11. 77 and also Board's Letter No. 10367/G, dated 24. 11. 75.

সাহিত্যবীথি

৮৪

চিত্তরঞ্জন সেন মজুমদার ডব্লিউ. বি. সি. এস
প্রাক্তন স্কুল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর
ও
সঞ্জীব সরকার
শিক্ষক, রাজেন্দ্র শিক্ষাসদন

ব্যানার্জী ব্রাদার্স
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক
কলিকাতা-৭০০০৬১

সাহিত্য বীথি

বাংলা (প্রথম ভাষা) সাহিত্য সংকলন

প্রথম প্রকাশ : শুভ পয়লা বৈশাখ, ১৩৮৩
সংশোধিত দ্বিতীয় প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৮৪
সংশোধিত তৃতীয় প্রকাশ : মাঘ, ১৩৮৪
সংশোধিত চতুর্থ প্রকাশ : অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭
সংশোধিত পঞ্চম প্রকাশ : শ্রীপঞ্চমী, ১৩৮৮
সংশোধিত ষষ্ঠ প্রকাশ : শুভ মহালয়া, ১৩৯২

মুদ্রাকর :
শ্রীসুধাতোষ বসু
ইম্প্রেশন
৩৩বি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

পদ্যাংশ

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ নির্দেশিত নূতন পাঠ্যক্রম

[ষষ্ঠ শ্রেণী]

বাংলা (প্রথম ভাষা)

গদ্যাংশে থাকিবে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, সমাজ-সংস্কারক ও মনীষীদের জীবনকথা, বৈচিত্র্যমূলক সাহিত্যিক ও দেশাত্মবোধক রচনা, গল্প, উপাখ্যান, ভ্রমণ-কাহিনী, অভিযান ও আবিষ্কার প্রভৃতি বিষয়ে প্রসিদ্ধ লেখকবর্গের রচনাংশ। সংকলনকারীর নিজস্ব রচনাও স্থান পাইতে পারে। গদ্যাংশে সাধু ও চলিত উভয় রীতির রচনা থাকা আবশ্যক।

পদ্যাংশে বিভিন্ন ভাব ও ছন্দের কবিতা সংকলন থাকিবে। এই পর্যায়ে বাংলা ও বাঙালীর জাতীয়তা-বিষয়ক কথার অবকাশ থাকাও বাঞ্ছনীয়।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[লেখক পরিচিতি ঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ঃ জুন ২৬, ১৮৩৮ ; মৃত্যু ঃ এপ্রিল ৮, ১৮৯৪)—নিবাস কাঁঠালপাড়া, চব্বিশ পরগণা। পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র এবং যদুনাথ বসু প্রথম বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। ছাত্রাবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সম্বাদ প্রভাকরে' পদ্য লিখিতেন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। তাঁহার রচিত উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ইত্যাদি।]

অনেকে কমলাকান্তকে পাগল বলিত। সে কখন কি বলিত, কি করিত, তাহার স্থিরতা ছিল না। লেখাপড়া না জানিত, এমত নহে। কিছু ইংরেজি, কিছু সংস্কৃত জানিত। কিন্তু যে বিদ্যায় অর্থোপার্জন হইল না, সে বিদ্যা কি বিদ্যা? আসল কথা এই, সাহেব সুবোর কাছে যাওয়া আসা চাই। কত বড় বড় মূর্খ, কেবল

নাম দস্তখত করিতে পারে,—তাহারা তালুক মুলুক করিল—আমার মতে তাহারাই পণ্ডিত। আর কমলাকান্তের মত বিদ্বান্ যাহারা কেবল কতকগুলা বহি পড়িয়াছে, তাহারা আমার মতে গণ্ডমূর্খ।

কমলাকান্তের একবার চাকরি হইয়াছিল। একজন সাহেব তাহার ইংরেজি কথা শুনিয়া, ডাকিয়া লইয়া গিয়া একটি কেরাণীগিরি দিয়াছিলেন। কিন্তু কমলাকান্ত চাকরি রাখিতে পারিল না। আপিসে গিয়া, আপিসের কাজ করিত না। সরকারি বহিতে কবিতা লিখিত—আপিসের চিঠিপত্রের উপর সেক্ষপীয়র নামক কে লেখক আছে, তাহার বচন তুলিয়া লিখিয়া রাখিত ; বিলবহির পাতায় ছবি আঁকিয়া রাখিত। এক বার সাহেব তাহাকে মাস্কাবারের পে-বিল প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিলেন। কমলাকান্ত বিলবহি লইয়া একটি চিত্র আঁকিল যে, কতকগুলি নাগা ফকির সাহেবের কাছে ভিক্ষা চাহিতেছে, সাহেব দুই চারিটি পয়সা ছড়াইয়া ফেলিয়া দিতেছেন। নীচে লিখিয়া দিল "যথার্থ পে-বিল।" সাহেব নূতনতর পে-বিল দেখিয়া কমলাকান্তকে মানে মানে বিদায় দিলেন।

কমলাকান্তের চাকরি সেই পর্যন্ত। অর্থেরও বড় প্রয়োজন ছিল না। কমলাকান্ত তখন দারপরিগ্রহ করে নাই। স্বয়ং যেখানে হয়, দুইটি অন্ন এবং আধ ভরি আফিম পাইলেই হইত। যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিত। অনেক দিন আমার বাড়ীতে ছিল। আমি তাহাকে পাগল বলিয়া যত্ন করিতাম। কিন্তু আমিও তাহাকে রাখিতে পারিলাম না। সে কোথাও স্থায়ী হইত না। এক দিন প্রাতে উঠিয়া ব্রহ্মচারীর মতো গেরুয়া-বস্ত্র পরিয়া, কোথায় চলিয়া গেল। কোথায় চলিয়া গেল, আর তাহাকে পাইলাম না। সে এ পর্যন্ত আর ফিরে নাই।

তাহার একটি দপ্তর ছিল। কমলাকান্তের কাছে ছেঁড়া কাগজ পড়িতে পাইত না ; দেখিলেই তাহাতে কি মাথা মুণ্ড লিখিত, কিছু বুঝিতে পারা যাইত না। কখন কখন আমাকে পড়িয়া শুনাইত —শুনিলে আমার নিদ্রা আসিত। কাগজগুলি একখানি মসীচিত্রিত, পুরাতন, জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা থাকিত। গমনকালে, কমলাকান্ত আমাকে সেই দপ্তরটি দিয়া গেল। বলিয়া গেল, তোমাকে ইহা বখ্‌শিশ করিলাম।

এ অমূল্য রত্ন লইয়া আমি কি করিব ? প্রথম মনে করিলাম, অগ্নিদেবকে উপহার দিই। পরে লোকহিতৈষিতা আমার চিত্তে বড় প্রবল হইল। মনে করিলাম যে, যে লোকের উপকার না করে, তাহার বৃথায় জন্ম। এই দপ্তরটিতে অনিদ্রার অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ আছে —যিনি পড়িবেন, তাঁহারই নিদ্রা আসিবে। যাঁহারা অনিদ্রারোগে পীড়িত, তাঁহাদিগের উপকারার্থে আমি কমলাকান্তের রচনাগুলি প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম।

—শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীস

অনুশীলনী

১. কমলাকান্তের দপ্তরটি কি ?
২. লেখকের মতে পণ্ডিত কাহারা ? এখানে 'পণ্ডিত' কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ?
৩. কমলাকান্তের চাকুরী গেল কেন ?
৪. কমলাকান্ত শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীসকে কি বখ্‌শিশ দিয়াছিলেন ?
৫. সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ : 'এই দপ্তরটিতে অনিদ্রার অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ আছে—'
৬. অর্থ লিখ : (ক) মসীচিত্রিত (খ) জীর্ণ (গ) লোকহিতৈষিতা (ঘ) পীড়িত (ঙ) প্রবৃত্ত।

যেন চেঁচাতে জানে না, লোকে বলে জাপানের ছেলেরা কাঁদে না। আমি এ পর্যন্ত একটি ছেলেকেও কাঁদতে দেখিনি। পথে মোটরে করে যাবার সময়ে, মাঝে মাঝে যেখানে ঠেলাগাড়ি প্রভৃতি বাধা এসে পড়ে, সেখানে মোটরের চালক শান্তভাবে অপেক্ষা করে—গাল দেয় না, হাঁকাহাঁকি করে না। পথের মধ্যে হঠাৎ একটা বাইসিকল মোটরের উপরে এসে পড়বার উপক্রম করলে আমাদের দেশের চালক এ অবস্থায় বাইসিকল আরোহীকে অনাবশ্যক গাল না দিয়ে থাকতে পারতো না। কিন্তু এখানে এরূপ অবস্থায় মোটর-চালক ভ্রূক্ষেপমাত্রও করে না। এখানকার বাঙালীদের কাছে শুনতে পেলুম যে, রাস্তায় দুই বাইসিকেল কিংবা গাড়ির সঙ্গে বাইসিকেলের ঠোকাঠুকি হয়ে যখন রক্তপাত হয়ে যায়, তখনও উভয় পক্ষ চেঁচামেচি গালমন্দ না করে গায়ের ধুলো ঝেড়ে চলে যায়।

আমার কাছে মনে হয়, এইটেই জাপানের শক্তির মূল কারণ। জাপানি বাজে চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি করে নিজের বল ক্ষয় করে না; প্রাণশক্তির বাজে খরচ নেই বলে এখানে প্রয়োজনের সময় শক্তির টানাটানি পড়ে না। শরীর-মনের এই শান্তি ও সহিষ্ণুতা ওদের স্বজাতীয় সাধনার একটা অঙ্গ। শোকে-দুঃখে, আঘাতে উত্তেজনায়, ওরা নিজেকে সংযত করে রাখতে জানে।

এই যে নিজের প্রকাশকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করে রাখা—এ ওদের কবিতাতেও দেখা যায়। তিন লাইনের কাব্য জগতে আর কোথাও নেই। এই তিন লাইনই ওদের কবি, পাঠক—উভয়ের পক্ষেই যথেষ্ট। সেই জন্যেই এখানে এসে অবধি রাস্তায় কেউ গান গাচ্ছে, এ আমি শুনি নি। এদের হৃদয় ঝরণার মতো শব্দ করে না, সরোবরের জলের মতো স্তব্ধ। সেই জন্যেই তিন লাইনেই এদের কুলোয়।

[লেখক পরিচিতি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (জন্ম : মে ৭, ১৮৬১ ; মৃত্যু : অগস্ট ৭, ১৯৪১) নিবাস—জোড়াসাঁকো, কলিকাতা ; পরে শান্তিনিকেতন, বীরভূম। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহন রায়ের বন্ধু প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র। স্কুল-কলেজের শিক্ষা রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নাই বটে কিন্তু তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ও তীক্ষ্ণ মনীষা বহু অধ্যয়নে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। গল্প, উপন্যাস, ব্যঙ্গ কৌতুক, দিনলিপি, ভ্রমণ-কাহিনী, ধর্মোপদেশ, শিক্ষা, রাজনীতি, শব্দ, ছন্দ, ভাষাতত্ত্ব, বিজ্ঞান, নাটক, গদ্য কবিতা, রূপক নাটক, প্রহসন, কবিতা, গান প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি সাহিত্যে 'নোবেল প্রাইজ' লাভ করেন। এতদ্‌ব্যতীত তিনি পৃথিবীর নানা দেশ হইতে এবং স্বদেশে বহু সম্মানে বিভূষিত হন।]

১৬ই জ্যৈষ্ঠ। আজ জাহাজ জাপানের কোবে বন্দরে পৌঁছবে। কয়দিন বৃষ্টি বাদলের বিরাম নেই। মাঝে মাঝে জাপানের ছোটো ছোটো দ্বীপ আকাশের দিকে পাহাড় তুলে সমুদ্র-যাত্রীদের ইসারা করছে—কিন্তু বৃষ্টিতে কুয়াসাতে সমস্ত ঝাপসা।

জাহাজ যখন একেবারে বন্দরে ভিড়লো, তখন মেঘ কেটে গিয়ে সূর্য উঠেছে। বড়ো বড়ো জাপানি অপ্সরা-নৌকা আকাশে পাল উড়িয়ে দিয়ে নৃত্য করছে।

জাপানের শহরের রাস্তায় বেরোলেই একটি জিনিস চোখে পড়ে। রাস্তায় লোকের ভিড় আছে, কিন্তু গোলমাল একেবারে নেই। এরা

কাল দুজন জাপানি মেয়ে এসে আমাকে এ দেশের ফুল সাজানোর বিদ্যা দেখিয়ে গেল। এর মধ্যে কতো আয়োজন, কতো চিন্তা, কতো নৈপুণ্য আছে, তার ঠিকানা নেই। প্রত্যেক পাতা এবং প্রত্যেক ডালটির উপর ফুল সাজাবার বেলায় মন দিতে হয়।

একটা বইয়ে পড়েছিলুম, প্রাচীনকালে বিখ্যাত যোদ্ধা যাঁরা ছিলেন, তাঁরা অবকাশ কালে এই ফুল সাজাবার বিদ্যা আলোচনা করতেন। তাঁদের ধারণা ছিল এতে তাঁদের রণ-দক্ষতা ও বীরত্বের উন্নতি হয়। এর থেকে বুঝতে পারবে, জাপানি নিজের এই সৌন্দর্য অনুভূতিকে সৌখীন জিনিস বলে মনে করে না, ওরা জানে এতে মানুষের শক্তি বৃদ্ধি হয়।

জাপানের ঘরগুলিতে আসবাব নেই বললেই হয়, অথচ মনে হয় যেন এ সমস্ত ঘর কী-একটাতে পূর্ণ, গম্‌গম্ করছে। একটি মাত্র ছবি, কিংবা একটি মাত্র পাত্র কোথাও আছে। যে জিনিস যথার্থ সুন্দর, তার চারিদিকে মস্ত একটি বিরলতার অবকাশ থাকা চাই। ভালো জিনিসকে ঘেঁসাঘেঁসি করে রাখা তাদের অপমান করা; এইরকম দুটি একটি ভালো জিনিস দেখালে, সে যে কী উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, এখানে এসে তা স্পষ্ট বুঝতে পারলুম।

অন্য দেশে গুণী এবং রসিকের মধ্যেই রূপ-রসের যে বোধ দেখতে পাওয়া যায়, এ দেশে সমস্ত জাতের মধ্যে তাই ছড়িয়ে পড়েছে। য়ুরোপে সর্বজনীন বিদ্যাশিক্ষা আছে, সর্বজনীন সৈনিকতার চর্চাও সেখানে অনেক জায়গায় প্রচলিত—কিন্তু এমনতরো সর্বজনীন রস-বোধের সাধনা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এখানে দেশের সমস্ত লোক সুন্দরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

তাতে এরা কি বিলাসী হয়েছে? অকর্মণ্য হয়েছে? জীবনের

কঠিন সমস্যা ভেদ করতে এরা কি উদাসীন কিংবা অক্ষম হয়েছে? ঠিক তার উল্টো এরা সৌন্দর্যসাধনা থেকেই মিতাচার শিখেছে, এই সৌন্দর্যসাধনা থেকেই এরা বীর্য, কর্মনৈপুণ্য লাভ করেছে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুশীলনী

১. জাপানের অধিবাসীদের সর্বস্তরে উন্নতির কারণগুলি আলোচনা করো।

২. জাপানিদের সৌন্দর্যচেতনা ও শিষ্টাচার সম্পর্কে তুমি কি জানো?

৩. প্রসঙ্গ নির্দেশ পূর্বক ব্যাখ্যা লেখো : (ক) এদের হৃদয় ঝরণার মতো শব্দ করে না, সরোবরের জলের মতো স্তব্ধ। (খ) এখানে দেশের সমস্ত লোক সুন্দরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

৪. নীচের শব্দগুলির পদ-পরিবর্তন করো : দক্ষতা, নৈপুণ্য, সর্বজনীন, সৌন্দর্য, বিদ্যা।

৫. লিঙ্গ পরিবর্তন করো : পাঠক, যাত্রী, সুন্দর, মেয়ে, কবি।

৬. "জাপান শহরের রাস্তায় বেরোলেই একটা জিনিস চোখে পড়ে"— জিনিসটি কি?

৭. "আমার কাছে মনে হয়, এইটিই জাপানের শক্তির মূল কারণ"— কারণটি বলো।

৮. কিসে জাপানিরা নিজেকে সংযত করে রাখতে জানে?

৯. 'সৌন্দর্যসাধনা' থেকে জাপানিরা কি কি শিখেছে?

[লেখক পরিচিতি ঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জন্ম : সেপ্টেম্বর ১৫, ১৮৭৬ ; মৃত্যু ঃ জানুআরি ১৬, ১৯৩৮)। নিবাস দেবানন্দপুর, হুগলী। ভাগলপুরে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। প্রথম জীবনে ব্রহ্মদেশে চাকুরী করিতেন, পরে সাহিত্য-সাধনাতেই সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বহু উপন্যাস-গ্রন্থের রচয়িতা। 'বড়দিদি', 'বিরাজ বৌ', 'বিন্দুর ছেলে', পল্লী সমাজ', 'দেনা পাওনা', 'দেবদাস', 'পণ্ডিতমশাই', চন্দ্রনাথ', 'শ্রীকান্ত', 'বিপ্রদাস', 'অরক্ষণীয়া', 'পথের দাবী', 'চরিত্রহীন', গৃহদাহ', 'শেষ প্রশ্ন' প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'নারীর মূল্য', 'স্বদেশ ও সাহিত্য' তাঁহার রচিত প্রবন্ধ পুস্তক। "বহুরূপী" কাহিনীটি 'শ্রীকান্ত' (প্রথম খণ্ড) হইতে সংকলিত।]

সে দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়াও শেষ হয় নাই। শ্রাবণের সমস্ত আকাশটা ঘনমেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে, এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে। আমরা তিন ভাই নিত্যপ্রথামত বাইরে বৈঠকখানার ঢালা বিছানার উপর রেড়ির তেলের সেজ জ্বালাইয়া বই খুলিয়া বসিয়া গিয়াছি। বাহিরের বারান্দায় একদিকে পিসেমশায় ক্যাম্বিশের খাটের উপর শুইয়া তাঁহার সান্ধ্যতন্দ্রাটুকু উপভোগ করিতেছেন, এবং অন্যদিকে বসিয়া বৃদ্ধ রামকমল ভট্চাজ অন্ধকারে

ধূমপান করিতেছেন। দেউড়িতে হিন্দুস্থানী পেয়াদাদের তুলসীদাসী সুর শোনা যাইতেছে, এবং ভিতরে আমরা তিন ভাই, মেজদা'র কঠোর তত্ত্বাবধানে নিঃশব্দে বিদ্যাভ্যাস করিতেছি।

অকস্মাৎ আমার ঠিক পিঠের কাছে একটা 'হুম্' শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোড়দা ও যতীনদার সমবেত আর্তকণ্ঠের গগনভেদী রৈ-রৈ চীৎকার – ওরে বাবা রে, খেয়ে ফেল্লে রে! কিসে ইহাদিগকে খাইয়া ফেলিল, আমি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিবার পূর্বেই, মেজদা মুখ তুলিয়া একটা বিকট শব্দ করিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে তাঁহার দুই-পা সম্মুখে ছড়াইয়া দিয়া সেজ উল্টাইয়া দিলেন। তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া গেল। ঠেলাঠেলি করিয়া বাহির হইতেই দেখি, পিসেমশাই তার দুই ছেলেকে বগলে চাপিয়া ধরিয়া তাহাদের অপেক্ষাও তেজে চেঁচাইয়া বাড়ি ফাটাইয়া ফেলিতেছেন! এ যেন তিন বাপ-ব্যাটার কে কতখানি হাঁ করিতে পারে, তারই লড়াই চলিতেছে।

এই সুযোগে একটা চোর নাকি ছুটিয়া পলাইতেছিল, দেউড়ির সিপাহীরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে।

মুহূর্তকাল মধ্যে আলোয়, চাকর-বাকরে ও পাশের লোকজনে উঠান পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দরোয়ানরা চোরকে মারিতে মারিতে আধমরা করিয়া টানিয়া আলোর সম্মুখে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। তখন চোরের মুখ দেখিয়া বাড়িসুদ্ধ লোকের মুখ শুকাইয়া গেল! আরে, এ যে ভট্‌চায্যি মশাই।

তখন কেহ বা জল, কেহ বা পাখার বাতাস দেয়।

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ভট্‌চায্যিমশাই কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন —"বাবা, বাঘ নয়, সে একটা মস্ত ভালুক।"

ছোড়দা ও যতীনদা বারবার কহিতে লাগিল, ভালুক নয় বাবা, একটা নেকড়ে বাঘ।

তখন কেহ বা বিশ্বাস্ করিল, কেহ বা করিল না। কিন্তু সবাই লণ্ঠন লইয়া ভয়চকিত নেত্রে চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল।

অকস্মাৎ পালোয়ান কিশোরী সিং 'উহ বয়ঠা' বলিয়াই একলাফে একেবারে বারান্দার উপর। উঠানের এক প্রান্তে একটি ডালিম গাছ ছিল, দেখা গেল, তাহারই ঝোপের মধ্যে বসিয়া একটা বৃহৎ জানোয়ার। বাঘের মতোই বটে। চক্ষের পলকে বারান্দা খালি হইয়া বৈঠকখানা ভরিয়া গেল—জনপ্রাণী আর সেখানে নাই। সেই ঘরের ভিড়ের মধ্য হইতে পিসেমশায়ের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আসিতে লাগিল—সড়কি লাও- বন্দুক লাও। আমাদের পাশের বাড়ির গগনবাবুদের একটা মুঙ্গেরী গাদা বন্দুক ছিল; লক্ষ্য সেই অস্ত্রটার উপর। 'লাও'তো বটে, কিন্তু আনে কে? ডালিম গাছটা যে দরজার কাছেই; এবং তাহারই মধ্যে যে বাঘ বসিয়া! হিন্দুস্থানীরা সাড়া দেয় না—তামাশা দেখিতে যাহারা বাড়ি ঢুকিয়াছিল. তাহারাও নিস্তব্ধ।

এমনি বিপদের সময় হঠাৎ কোথা হইতে ইন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। সে বোধ করি সুমুখের রাস্তা দিয়া চলিয়াছিল, হাঙ্গামা শুনিয়া বাড়ি ঢুকিয়াছে। নিমেষে শতকণ্ঠ চীৎকার করিয়া উঠিল—'ওরে বাঘ! বাঘ!'

প্রথমটা সে থতমত খাইয়া ছুটিয়া আসিয়া ভিতরে ঢুকিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই ব্যাপারটা শুনিয়া লইয়া একাই নির্ভয়ে উঠানে নামিয়া গিয়া লণ্ঠন তুলিয়া বাঘ দেখিতে লাগিল।

দোতলার জানালা হইতে মেয়েরা রুদ্ধনিঃশ্বাস এই ডাকাত ছেলেটির পানে চাহিয়া দুর্গানাম জপিতে লাগিল। পিসিমা তো

ভয়ে কাঁদিয়াই ফেলিলেন। নীচে ভিড়ের মধ্যে গাদাগাদি দাঁড়াইয়া হিন্দুস্থানী সিপাহীরা তাহাকে সাহস দিতে লাগিল এবং এক-একটা অস্ত্র পাইলেই নামিয়া আসে, এমন আভাসও দিল।

বেশ করিয়া দেখিয়া ইন্দ্র কহিল, দ্বারিকবাবু, এ বাঘ নয় বোধ হয়। তাহার কথাটা শেষ হইতে না হইতেই সেই জানোয়ারটা দুই থাবা জোড় করিয়া মানুষের গলায় কাঁদিয়া উঠিল। পরিষ্কার বাংলা করিয়া কহিল, 'না বাবুমশাই, না। আমি বাঘ-ভালুক নই—ছিনাথ বউরূপী।' ইন্দ্র হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভট্চায্যিমশাই খড়ম হাতে সর্বাগ্রে ছুটিয়া আসিলেন।

কিশোরা সিং তাহাকে সর্বাগ্রে দেখিয়াছিল, সুতরাং তাহারই দাবি সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া সেই গিয়া তাহার কান ধরিয়া হিড়-হিড় করিয়া টানিয়া আনিল। ভট্চায্যিমশাই তাহার পিঠের উপর খড়মের এক ঘা বসাইয়া দিলেন।

ছিনাথের বাড়ি বারাসতে। সে প্রতিবৎসর এই সময়টায় একবার করিয়া রোজগার করিতে আসে। কালও এ বাড়িতে সে নারদ সাজিয়া গান শুনাইয়া গিয়াছিল।

সে একবার ভট্চায্যিমশায়ের, একবার পিসেমশায়ের পায়ে পড়িতে লাগিল। কহিল, ছেলেরা অমন করিয়া ভয় পাইয়া প্রদীপ উল্টাইয়া মহামারী কাণ্ড বাধাইয়া তোলায় সে নিজেও ভয় পাইয়া গাছের আড়ালে লুকাইয়াছিল। ভাবিয়াছিল, একটু ঠাণ্ডা হইলেই বাহির হইয়া তাহার সাজ দেখাইয়া যাইবে। কিন্তু ব্যাপার উত্তরোত্তর এমন হইয়া উঠিল যে, তাহার আর সাহসে কুলাইল না। ছিনাথ কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল, কিন্তু পিসেমশায়ের আর রাগ পড়ে না। পিসিমা নিজে উপর হইতে কহিলেন, তোমাদের

ভাগ্যি ভাল যে সত্যিকারের বাঘ-ভালুক বার হয়নি। যে বীরপুরুষ তোমরা, আর তোমার দরোয়ানেরা। ছেড়ে দাও বেচারীকে, আর দূর করে দাও দেউড়ির ঐ খোট্টাগুলোকে। একটা ছোট ছেলের যা সাহস, একবাড়ি লোকের তা নেই। পিসেমশাই কোন কথাই শুনিলেন না, বরং পিসিমার এই অভিযোগে চোখ পাকাইয়া এমন একটা ভাব ধারণ করিলেন যে, ইচ্ছা করিলেই তিনি এই সকল কথার যথেষ্ট সদুত্তর দিতে পারেন। কিন্তু স্ত্রীলোকের কথার উত্তর দিতে যাওয়াই পুরুষমানুষের পক্ষে অপমানকর। তাই আরও গরম হইয়া হুকুম দিলেন, 'উহার ল্যাজ কাটিয়া দাও। তখন তাহার সেই রঙিন-কাপড়-জড়ানো সুদীর্ঘ খড়ের ল্যাজ কাটিয়া লইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল।

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অনুশীলনী

১. 'সে দিনটা আমার খুব মনে পড়ে'—বক্তা কে? কোন্ 'দিনটা'র কথা বলা হয়েছে? 'সে দিনটা' মনে পড়ার কারণই বা কি?

২. 'দোতলার জানালা হইতে মেয়েরা রুদ্ধনিঃশ্বাসে এই ডাকাত ছেলেটির পানে চাহিয়া দুর্গানাম জপিতে লাগিল'—কোন্ প্রসঙ্গে উক্তিটি করা হয়েছে? ডাকাত ছেলেটি কে? তার ডাকাতেপনার কি পরিচয় পাওয়া যায়?

৩. সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লেখো: (ক) এ যেন তিন বাপ-ব্যাটার কে কতখানি হাঁ করিতে পারে, তারই লড়াই চলিতেছে। (খ) 'লাও' তো বটে, কিন্তু আনে কে?

৪. নিম্নলিখিত শব্দগুলির সাহায্যে বাক্য রচনা করো: মুঙ্গেরী, বহুরূপী, নিমীলিত চক্ষে, গগনভেদী।

৫. সন্ধি বিচ্ছেদ করো: পরিষ্কার, সমাচ্ছন্ন, দীপালোক।

৬. শূন্যস্থানে গল্পের কথা বসাও: (ক) সারাদিন—বৃষ্টিপাত হইয়াও শেষ হয় নাই।—সমস্ত আকাশটা ঘনমেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে। (খ) দেউড়িতে হিন্দুস্থানী—তুলসীদাসী সুর শোনা যাইতেছে। (গ) তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন—বাধিয়া গেল। (ঘ) কালও এ বাড়িতে সে—সাজিয়া গান শুনাইয়া গিয়াছিল।

৭. বহুরূপী ও দক্ষযজ্ঞ সম্বন্ধে পাঁচটি করে বাক্য রচনা করো।
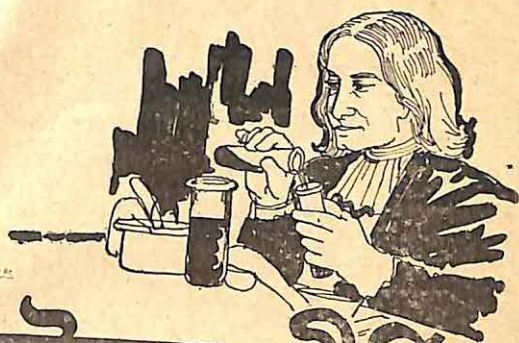
নিউটনের কীর্তি

—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

[লেখক পরিচিতি : রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (জন্ম : অগস্ট ২০, ১৮৬৪ ; মৃত্যু : জুন ৬, ১৯১৯)—নিবাস জেমো, মুর্শিদাবাদ। পিতার নাম গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী। এম. এ. পরীক্ষায় বিজ্ঞানে (পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র) প্রথমস্থান অধিকার করেন। রামেন্দ্রসুন্দর 'প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ' বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। প্রথমে রিপন কলেজের অধ্যাপক এবং পরে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ 'প্রকৃতি', 'জিজ্ঞাসা', 'কর্মকথা', 'জগৎকথা', 'যজ্ঞকথা', 'নানাকথা', 'চরিত্রকথা', 'বিচিত্র জগৎ' প্রভৃতি।]

প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে ইংলণ্ড দেশে নিউটন জন্মিয়াছিলেন। তিনি যে বৎসর জন্মিয়াছিলেন সেই বৎসর গালিলিওর মৃত্যু হয়। গালিলিও ইটালিদেশবাসী ছিলেন। গালিলিওর নাম পণ্ডিত সমাজে বিখ্যাত। গালিলিও "পেণ্ডুলমযুক্ত" ঘড়ি বাহির করেন। গালিলিও আরও অনেক বড় বড় কাজ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি সে কথা বলিবার দরকার নাই। গালিলিও খুব বড় লোক ছিলেন, কিন্তু নিউটন তাঁহার অপেক্ষাও বড় লোক।

নিউটনের প্রধান কাজ কি ? তোমরা হয়ত শুনিয়া থাকিবে, নিউটন মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই রকম একটা গল্প আছে যে, নিউটন একদিন এক বাগানে বসিয়া ভাবিতেছিলেন। এমন সময় গাছ হইতে একটা আপেল ফল নীচে পড়িল। অমনি নিউটন স্থির করিলেন, পৃথিবীর এমন একটা ক্ষমতা আছে, যাহার দ্বারা অন্য বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে বা টানিয়া লয়। সেই ক্ষমতার নাম মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। পৃথিবীর সেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে, তাহাতেই পৃথিবীর অন্যান্য দ্রব্যকে আপনার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে।

প্রথমতঃ অনেকে সন্দেহ করেন গল্পটা হয়ত আদৌ সত্য নহে। আপেল পড়ার গল্প সত্য হউক বা না হউক তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। আপেল নীচের দিকে কিরূপে পড়ে, এই তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে নিউটনের বহু বৎসর ধরিয়া চিন্তা করিতে হইয়াছিল। একদিন অকস্মাৎ নিউটন তাহা বুঝিতে পারেন নাই ; এবং বহু বৎসর তিনি এই বিষয়ের চিন্তা করিয়া মনুষ্যজাতিকে যাহা শিখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অতি অদ্ভুত ব্যাপার। তোমাদিগকে এখন তাহা বুঝাইয়া দিতে পারিব না। আশা করি কালক্রমে তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে।

তথাপি স্থূল কথাটা জানা ভাল। তোমাদের যদি এরূপ বিশ্বাস থাকে যে, পৃথিবীর ভিতরে মাধ্যাকর্ষণ নামে একটা শক্তি আছে তাহারই বলে পৃথিবী অন্য পদার্থকে টানে আর অন্য পদার্থে সে শক্তি নাই, তাই তাহারা পৃথিবীকে টানিতে পারে না, তাহা হইলে তোমাদের সে বিশ্বাস ভুল। বস্তুত নিউটন সেইরূপ কিছু আবিষ্কার করেন নাই। যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে পৃথিবী কোন

পদার্থকে স্বয়ং আকর্ষণ করিতে পারে, নিউটন তাহা নিজেই বিশ্বাস করিতেন না।

তবে নিউটনের কাজটা কি? একটা ফল হাত হইতে ফেলিলে উপরে না যাইয়া নিম্নে পৃথিবীর দিকে চলে। ইহা তোমরাও জান, নিউটন্‌ও জানিতেন, তাহার পূর্বেও লোক জানিত। পৃথিবী ফলকে আকর্ষণ করে বলিলে সেই কথাটা ঘুরাইয়া বলা হইল। নূতন কথা কিছুই হইল না। নিউটন এমন নির্বোধের মত লোক ছিলেন না যে, একটা কথাকে ঘুরাইয়া বলিয়া বাহাদুরী লইবেন।

তবে নিউটনের বাহাদুরী কিসে? অন্য লোকে দেখে ফলটা পৃথিবীর দিকে যাইতেছে, নিউটন প্রথমে দেখিয়াছিলেন যে, ফল যেমন পৃথিবীর দিকে যায়, পৃথিবীও ঠিক তেমনি ফলের দিকে যায়। অন্য লোকে দেখে, পৃথিবী ফলকে টানে বা আকর্ষণ করে; নিউটন দেখিয়াছিলেন, ফলটিও পৃথিবীটাকে টানে বা আকর্ষণ করে শুধু তাহাই নহে, অতএব প্রকাণ্ড পৃথিবী ক্ষুদ্র ফলটিকে যে বলে টানে, ক্ষুদ্র ফলটিও প্রকাণ্ড পৃথিবীকে ঠিক সেই বলে টানে। উভয়ের প্রতি টান উভয়েরই সমান।

তোমরা হয়ত জিজ্ঞাসা করিবে, সে আবার কি? তবে পৃথিবী ফলের কাছে যায় না কেন; ফলই বা পৃথিবীর দিকে যায় কেন?

উত্তর এই,—পৃথিবী খুব বড়, তাই ফল তাহাকে টানিয়াও অধিক কাছে আনিতে পারে না। আর ফল খুব ছোট তাই পৃথিবী সমান বলে টানিয়া তাহাকে আপনার দিকে আনে।

আর একটা কথা নিউটন প্রমাণ করেন। যে কারণে আম, জাম, নারিকেল পৃথিবীর দিকে যায়, সেই কারণে দূরস্থিত চন্দ্রও পৃথিবীর দিকে চলে। চন্দ্র আমাদের পৃথিবী হইতে অনেক দূরে আছে, লক্ষ ক্রোশেরও কিছু অধিক দূরে আছে। কিন্তু সেখানে থাকিয়াও চন্দ্রের অব্যাহতি নাই। গাছের নারিকেলটা যেমন পৃথিবীতে পড়িতে চেষ্টা করিতেছে, চন্দ্রও ঠিক সেইরূপ পৃথিবীতে পড়িতে যাইতেছে। প্রভেদ এই, নারিকেলটা যতক্ষণ গাছ হইতে না খসে, যতক্ষণ উহার বোঁটা

শক্তভাবে উহাকে ধরিয়া থাকে, ততক্ষণ উহা পড়িতে পায় না, আর বোঁটাটি ছিঁড়িয়া গেলেই পড়িয়া যায়। চন্দ্রকে কেহ ধরিয়া বা আটকাইয়া নাই, তাই চন্দ্র ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে পড়িতেছে।

তোমরা হয়ত আশ্চর্য হইবে। বলিবে,—কৈ চন্দ্র তো কতদিন আমাদের মাথার উপর উঠে, ফলের মত যদি চন্দ্রের পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে এতদিন আমাদের মাথা ভাঙ্গিয়া যাইত। চন্দ্র পড়ে কৈ।

মনে কর, চন্দ্রকে যেন কেহ প্রভূত বেগে পূর্বমুখে ছুঁড়িয়া দিয়াছে, তাই পূর্বমুখে চলিতে চলিতে সাতাইশ দিনে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আবার স্বস্থানে ঘুরিয়া আসে ও আবার চলিতে থাকে। পৃথিবীকে একেবারে ছাড়িয়া যাইতে পারে না। চন্দ্রের যদি এই পূর্বমুখে বেগটুকু না থাকিত, তাহা হইলে চন্দ্র এতদিন বৃক্ষচ্যুত নারিকেলের ন্যায় পৃথিবীতে আসিয়া আঘাত করিত। তবে নারিকেল ফলটা মাটিতে পড়িলে আমাদের কিছু লাভ হয়। আর চন্দ্রের মতো প্রকাণ্ড পদার্থটা মাটিতে পড়িলে আমরা কি, আমাদের পৃথিবীটাই হয়ত ভাঙিয়া যাইত।

স্থূলভাবে সহজ কথায় নিউটনের এই নীতিকথা তোমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু ইহাতে তোমরা মনে করিও না যে, এই ব্যাখ্যায় তোমরা নিউটনের ক্ষমতার সহস্রাংশেরও পরিচয় পাইলে।

(সংক্ষিপ্ত)

অনুশীলনী

১. গালিলিও কে ছিলেন ?
২. নিউটন সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লিখ।
৩. 'মাধ্যাকর্ষণ' সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য বুঝাইয়া দাও।
৪. বাক্য রচনা করো : বৃক্ষচ্যুত, আকর্ষণ, নির্বোধ, বাহাদুরী, ও দূরস্থিত।
৫. অর্থ লিখ : সহস্রাংশ, স্থূল, বেষ্টন, স্বস্থান ও প্রভেদ।

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়

—জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

[লেখক পরিচিতি ঃ স্যার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (জন্ম ঃ সেপ্টেম্বর ১৪, ১৮৮৪)— পিতার নাম রামচন্দ্র ঘোষ। তিনি গিরিডি বিদ্যালয়, কলিকাতা এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি' লাভ করেন। ১৯১৫-২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তাহার পর ১৯২১-৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২৪-২৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্সের ডীন ছিলেন। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে 'স্যার' উপাধি পান। ১৯৫৪-৫৫ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন।]

তখন দেশের দারুণ দুর্দিন। শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বেকারে দেশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আচার্যদেব দেখিতে পাইলেন বাংলার এই যুবক সম্প্রদায় অভিমানী, সংগ্রাম-বিমুখ, পরিশ্রমকাতর এবং পরমুখাপেক্ষী। তাহাদের জীবনের এই অসহায় অবস্থা প্রেমিক প্রফুল্লচন্দ্রের চিত্তকে আন্দোলিত করিয়া তুলিল। বাঙালীর প্রধান

অবলম্বন চাকুরী। কিন্তু চাকুরী কোথায়? বাঙালী যুবককে চাকুরীর ভিখারী না হইয়া কর্মঠ ও স্বাবলম্বী হইবার আহ্বান তিনি জানাইলেন। সকল প্রকার বিলাস বর্জন করিয়া সংযম ও অধ্যবসায়ের বলে তাহারা নব নব জ্ঞানের সম্পদ জয় করিয়া লইতে পারিবে। আচার্যদেব তাঁহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, প্রেম এবং আত্মবিশ্বাস লইয়া সহস্র জীবনের সমস্যা সমাধানে ব্রতী হইলেন। তাঁহার চিররুগ্ন দেহ এই কাজের গতিকে ব্যাহত করিতে পারে নাই। পথে পিছাইয়া পড়িবার মতো ক্লান্তি তাঁহার ছিল না।

অতি সামান্য মূলধন সম্বল করিয়া তিনি এক ঔষধ তৈয়ারীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বাঙালী যুবকগণকে ব্যবসায়ী ও শ্রমজীবী হইবার জন্য নানা ব্যবসায় ও নব নব শিল্প প্রতিষ্ঠানে পথ করিয়া দিলেন। দারিদ্র্যের পাশবশক্তির বিরুদ্ধে এই নূতন ধরনের যুদ্ধের আহ্বানে বাংলার যুবকেরা আন্তরিকভাবে সাড়া দিল এবং কর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হইয়া আসিল। আচার্যদেবের চেষ্টায় বাংলার শিল্পক্ষেত্রে নূতন করিয়া প্রাণসঞ্চার হইল। এই শীর্ণকায় মানুষটি কারখানার উন্নতিকল্পে সমস্ত শক্তি ও ইচ্ছা কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন। এই কারখানাটিকে পরে একটি লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত করেন। ইহা বর্তমানে ভারতের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। এই কারখানা হইতে যাহা পাইয়াছেন তাহা হয় কারখানার শ্রমিকদের জন্য ব্যয়িত হইত নয় অন্য এক তহবিলে জমা হইত, যাহা নিঃশেষে আর্তের সেবায় লাগিয়া যাইত।

বাংলার সমাজ-জীবন ও রাজনীতিক্ষেত্র হইতেও তিনি দূরে সরিয়া থাকেন নাই। সমাজের অনাচার, অত্যাচার, দুর্বলতা,

কাপুরুষতা তাঁহাকে পীড়িত করিয়া তুলিত। তিনি তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে, বুদ্ধি দিয়া, জ্ঞান দিয়া, সহযোগিতা প্রবর্তক হৃদ্যতার মধ্য দিয়া মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন বাংলার সমাজ-জীবনে এক নূতন চেতনা আনিয়াছিলেন। যুবককাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত বাংলার অতীত ও বর্তমান সমাজচেতনাকে তাঁহার রচনার মধ্যে পুঞ্জীভূত করিয়া জাতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই সাহিত্য তাঁহার দরদী মনের দীর্ঘ তথ্যপূর্ণ ইতিহাস। তাঁহার স্বদেশপ্রেমের আর একটি নিদর্শন ভারতীয় রাসায়নিক শাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করা। তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাঁহার রচিত এই বিস্মৃত অতীতের গৌরবময় সংস্কৃতির কাহিনী দেশের ভবিষ্যৎ চিত্তকে সঞ্জীবনীর রসধারায় অভিষিক্ত করিবে। পরাধীনতার জ্বালা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। স্বরাজের স্বপ্ন তিনি দেখিতেন স্বরাজ পাইবার জন্য তিনি পাগল হইয়া উঠিলেন। বাংলার যুবশক্তি দেশকে মুক্ত করিবার জন্য যে বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল তাহাতে আচার্য রায়ের সহানুভূতি ও অনুপ্রেরণা কম নহে। আচার্য রায়ের আবাসস্থল সায়ান্স কলেজ হইতে গোপনে শৈলেন ঘোষের আমেরিকা যাত্রা ইহার একটি দৃষ্টান্ত।

উপনিষদে কথিত আছে যিনি এক তিনি বলেন, "আমি বহু হইব"। সৃষ্টির মূলেই আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও নিজের চিত্তকে বহুমানবের দুঃখের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া রাখিলেন। দেখিয়াছি বিজ্ঞানের মায়া কাটাইয়া তিনি রাজপথে বাহির হইয়াছেন ভিক্ষার ঝুলি লইয়া। দুর্যোগে, সঙ্কটে, ভূমিকম্পে, জলপ্লাবনে আর্তের পরিত্রাণের জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে টানিয়া লইয়া ছিলেন এই জনসেবার

কাজে। ধনীরা দিয়াছে প্রচুর অর্থ। সহস্র সহস্র গৃহ হইতে আসিয়াছে মুষ্টি ভিক্ষা ও রাশি রাশি বস্ত্র। দলে দলে যুবকেরা স্বেচ্ছাসেবক রূপে তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে খুলনা, দামোদর, উত্তর বঙ্গ ও বিহারে অন্নবস্ত্র ও ঔষধ বিতরণের জন্য। আচার্যদেবের আগমন দুর্গতদের দিয়াছে শান্তির প্রলেপন, দিয়াছে এ সুন্দর ভুবনে বাঁচিয়া থাকিবার আশা।

স্বার্থ বলিতে তাঁহার অবচেতন মনেও কিছু ছিল না। দেশের দরিদ্র নারায়ণের পরিত্রাণের জন্য তিনি আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া লইয়া এই সর্বত্যাগী বৃদ্ধ, কর্মবীর মহাপুরুষ জীবন সন্ধ্যায় কালের ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করিয়া গ্রামে গ্রামে নগরে ঘুরিয়া দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন দেশসেবায় জনহিতকর কার্যে নিজেদের উৎসর্গীকৃত করিতে। দারিদ্র্য, মুর্খতা, অস্পৃশ্যতা ও পরাধীনতার অভিশাপে অসাড় হইয়াছিল দেশের লক্ষ লক্ষ মন। তিনি সেই অসাড় মনকে জাগাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিলেন তাঁহার অভিনব চিন্তাশক্তির ধারায়। তাঁহার অতি প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে দেশের পঙ্গু কর্মক্ষেত্রগুলি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।

অনুশীলনী

১. আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনী নিজের ভাষায় লিখ।
২. দুর্যোগে, সঙ্কটে, ভূমিকম্পে, জলপ্লাবনে আর্তের পরিত্রাণের জন্য তিনি কি করিয়াছিলেন?
৩. বেকার যুবশক্তির জন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের দান কি?
৪. অর্থ লিখ: (ক) জ্ঞানতপস্বী (খ) নিরলস (গ) অলৌকিক (ঘ) তন্দ্রাচ্ছন্ন (ঙ) পুঞ্জীভূত (চ) প্রলেপন (ছ) উত্তরীয় (জ) অস্পৃশ্যতা (ঝ) সঞ্জীবিত (ঞ) পঙ্গু।
৫. সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ: (ক) এই কারখানাটিকে পরে একটি লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত করেন। (খ) তাঁহার অতি প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে দেশের পঙ্গু কর্মক্ষেত্রগুলি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।

[লেখক পরিচিতি ঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম ঃ সেপ্টেম্বর ১২, ১৮৯৪ ; মৃত্যু ঃ নভেম্বর ১, ১৯৫০)—পিতৃনিবাস ব্যারাকপুর, বনগ্রাম মহকুমা, চব্বিশ পরগণা। বিভূতিভূষণ বি.এ. পাস করিয়া শিক্ষকতা কর্মে নিযুক্ত হন। ভাগলপুরে তাঁহার "পথের পাঁচালী" রচিত হয়। তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা—"পথের পাঁচালী", "দৃষ্টি প্রদীপ", "আরণ্যক", অভিযাত্রিক", "যাত্রাবদল", "মৌরিফুল", প্রভৃতি। সুবিখ্যাত "পথের পাঁচালী" গ্রন্থ হইতে "গ্রাম্য পাঠশালা" শীর্ষক গল্পটি গৃহীত হইয়াছে।]

গ্রামের প্রসন্ন গুরুমহাশয় বাড়ীতে একখানা মুদির দোকান করিতেন। এবং দোকানের পাশেই তাঁহার পাঠশালা ছিল। বেত ছাড়া পাঠশালায় শিক্ষাদানের বিশেষ উপকরণ-বাহুল্য ছিল না তবে এই বেতের উপর অভিভাবকদেরও বিশ্বাস গুরুমহাশয়ের অপেক্ষা কিছু কম নয়। তাই তাঁহারা গুরুমহাশয়কে বলিয়া দিয়াছিলেন, ছেলেদের শুধু পা খোঁড়া এবং চোখ কানা না হয়, এইটুকু মাত্র নজর রাখিয়া তিনি যত ইচ্ছা বেত চালাইতে পারেন। গুরুমহাশয়ও তাঁহার শিক্ষাদানের উপযুক্ত ক্ষমতা ও উপকরণের অভাব একমাত্র বেতের সাহায্যে পূর্ণ করিবার চেষ্টায় এইরূপ বেপরোয়াভাবে বেত চালাইয়া থাকেন যে ছাত্রগণ পা খোঁড়া ও চক্ষু কানা হওয়ার দুর্ঘটনা হইতে কোনরূপে প্রাণে বাঁচিয়া যায় মাত্র।

পাঠশালা বসিয়াছে। গুরুমহাশয় দোকানের মাচায় বসিয়া

দাঁড়িতে সৈন্ধব লবণ ওজন করিয়া কাহাকে দিতেছেন, কয়েকটি বড় বড় ছেলে আপন আপন চাটাইয়ে বসিয়া নানারূপ কুস্বর করিয়া কি পড়িতেছে ও ভয়ানক দুলিতেছে। তাহার অপেক্ষা আর একটু ছোট একটি ছেলে দেয়ালে ঠেস দিয়া আপন মনে পাত্‌তাড়ির তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতেছে। আর একটি বড় ছেলে, তাহার গালে একটা বড় আঁচিল, সে দোকানের মাচার নীচে চাহিয়া কি লক্ষ্য করিতেছে। তাহার সামনে দু'জন ছেলে বসিয়া শ্লেটে একটা ঘর আঁকিয়া কি করিতেছিল। একজন চুপি চুপি বলিতেছিল, আমি এই ঢ্যারা দিলাম ; অন্য ছেলেটি বলিতেছিল, এই আমার গোল্লা। সঙ্গে সঙ্গে তার শ্লেটে আঁক পাড়িতেছিল ও মাঝে মাঝে আড়চোখে বিক্রয়রত গুরুমহাশয়ের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। অপু নিজের শ্লেটে বড় বড় করিয়া বানান লিখিতেছিল। কতক্ষণ পরে ঠিক জানা যায় না, গুরুমহাশয় হঠাৎ বলিলেন—এই ফণে, শ্লেটে ওসব কি হচ্ছে রে ? সম্মুখের সেই ছেলে দুটি অমনি শ্লেটখানা চাপা দিয়া ফেলিল ; কিন্তু গুরুমহাশয়ের শ্যেনদৃষ্টি এড়ান বড় শক্ত, তিনি বলিলেন এই, সতে, ফণের শ্লেটটা নিয়ে আয় তো। তাঁহার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে ফণে ছোঁ মারিয়া শ্লেটখানা উঠাইয়া লইয়া গিয়া দোকানের মাচার উপর হাজির করিল।—হুঁ, এসব কি হচ্ছে শ্লেটে—সতে, ধ'রে নিয়ে আয় তো দু'জনকে, কান ধ'রে নিয়ে আয়।

যে ভাবে বড় ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেট লইয়া গেল, এবং যে ভাবে অপ্রসন্নমুখে সামনের ছেলে দুটি পায়ে পায়ে গুরুমহাশয়ের কাছে যাইতেছিল, তাহাতে হঠাৎ পাঠশালার নবাগত ছাত্র অপুর বড় হাসি পাইল, সে ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। পরে খানিকটা হাসি চাপিয়া রাখিয়া আবার ফিক ফিক করিয়া হাসিয়া উঠিল।

গুরুমহাশয় বলিলেন, হাসে কে ? হাসচো কেন খোকা, এটা কি নাট্যশালা ? অঁ্যা ? এটা নাট্যশালা নাকি ? নাট্যশালা কি অপু তাহা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল।

—সতে, একখানা থান ইঁট নিয়ে আয় তো তেঁতুলতলা থেকে, বেশ বড় দেখে।

অপু ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, তাহার গলা পর্যন্ত কাঠ হইয়া গেল কিন্তু ইঁট আনীত হইলে সে দেখিল ইঁটের ব্যবস্থা তাহার জন্য নহে, ঐ ছেলে দুটির জন্য। বয়স অল্প বলিয়াই হউক বা নূতন-ভর্তি ছাত্র বলিয়াই হউক, গুরুমহাশয় সে যাত্রা তাহাকে রেহাই দিলেন।

পাঠশালা বসিত বৈকালে। সবশুদ্ধ আট-দশটি ছেলেমেয়ে পড়িতে আসে। সকলেই বাড়ী হইতে ছোট ছোট মাদুর আনিয়া পাতিয়া বসে ; অপুর মাদুর নাই, সে বাড়ী হইতে একখানা জীর্ণ কার্পেটের আসন আনিয়াছে। যে ঘরটায় পাঠশালা হয়, তাহার কোন দিকে বেড়া বা দেওয়াল কিছুই নাই, চারিধার খোলা। ঘরের মধ্যে সারি দিয়া ছাত্রগণ বসে। পাঠশালা-ঘরের চারিপাশে বন, পিছন দিকে গুরুমহাশয়ের পৈতৃক আমলের বাগান; অপরাহ্লের তাজা গরমরৌদ্র, বাতাবী লেবু, গাব ও পেয়ারাফুলী আমগাছটার ফাঁক দিয়া পাঠশালা-ঘরের বাঁশের খুঁটির গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। নিকটে অন্য কোন বাড়ী নাই, শুধু বন আর বাগান, একধারে একটি সরু পথ।

আট-দশটি ছেলেমেয়ের মধ্যে সকলেই বেজায় দুলিয়া ও নানারূপ সুর করিয়া পড়া মুখস্থ করে ; মাঝে মাঝে গুরুমহাশয়ের গলা শোনা যায়—এই ক্যাবলা ওর শ্লেটের দিক চেয়ে কি দেখছিস ? কান মলে ছিঁড়ে দেবো একেবারে। নুটু, তোমার ক'বার নেতি ভিজুতে হবে ? ফের যদি নেতি ভিজুতে উঠেচ····

গুরুমহাশয় একটি খুঁটি হেলান দিয়া একখানা তালপাতার চাটাইয়ের উপর বসিয়া থাকেন। মাথার তেলে বাঁশের খুটির হেলান দেওয়া অংশটা পাকিয়া গিয়াছে। বিকাল বেলা প্রায়ই গ্রামের দীনু পালিত কি রাজু রায় তাঁহার সহিত গল্প করিতে আসেন। পড়াশুনার চেয়ে এই গল্প শোনা অপুর অনেক বেশী ভাল লাগিত। রাজুরায় মহাশয় প্রথম যৌবনে 'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস' স্মরণ করিয়া, কি করিয়া আষাঢ়ুর হাটে তামাকের দোকান খুলিয়াছিলেন, সে গল্প করিতেন। অপু অবাক হইয়া শুনিত এবং কল্পনায় ভাবিতে থাকিত —বেশ কেমন নিজের ছোট দোকানের ঝাঁপটা তুলিয়া বসিয়া দা দিয়া তামাক কাটা, তারপর রাত্রে নদীতে যাওয়া, ছোট হাঁড়িতে মাছের ঝোল, ভাত রাঁধিয়া খাওয়া, মাঝে মাঝে তাদের সেই ছেঁড়া মহাভারতখানা,—কি বাবার সেই দাশু রায়ের পাঁচালীখানা মাটির প্রদীপের সামনে খুলিয়া বসিয়া পড়া! বাহিরে অন্ধকার—বর্ষারাতে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়িতেছে, কেহ কোথাও নাই, পিছনের ডোবায় ব্যাঙ ডাকিতেছে—কি সুন্দর! বড় হইলে সে তামাকের দোকান করিবে।

গল্প বলিতে বলিতে বেলা যাইত। পাঠশালার চারিপাশের বন-জঙ্গলে অপরাহ্নের রাঙা রৌদ্র বাঁকা ভাবে আসিয়া পড়িত। কাঁঠাল গাছের ও জগ্‌গডুমুর গাছের ডালে-ঝোলা গুলঞ্চ-লতার গায়ে টুনটুনি পাখী মুখ উঁচু করিয়া বসিয়া দোল খাইত। পাঠশালা-ঘরে বনের লতাপাতার গন্ধের সঙ্গে তালপাতার চাটাই, ছেঁড়াখোঁড়া বই দপ্তর, পাঠশালার মাটির মেঝে ও কড়া দা-কাটা তামাকের ধোঁয়া, সবশুদ্ধ মিলিয়া এক জটিল গন্ধের সৃষ্টি করিত।

—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুশীলনী

১. গ্রাম্য পাঠশালাটির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২. 'হাসচো কেন খোকা, এটা কি নাট্যশালা? অ্যাঁ? এটা নাট্যশালা নাকি?—বক্তা কে? খোকাটিই বা কে? খোকার হাসার কারণ কি? নাট্যশালা বলতে কি বোঝো?

৩. গ্রামবাসীদের গল্প অপুর মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতো?

৪. সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লেখো: (ক) বেত ছাড়া পাঠশালায় শিক্ষাদানের বিশেষ উপকরণ বাহুল্য ছিল না। (খ) পড়াশুনার চেয়ে এই গল্প শোনা অপুর অনেক বেশী ভাল লাগিত।

৫. নীচের শব্দগুলিকে স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ করো: নাট্যশালা, গুরুমহাশয়, বাণিজ্য, উপকরণ, নবাগত।

৬. চক্ষু ও পাখী—এই শব্দ দুইটির তিনটি করে সমশব্দ লেখো।

৭. উত্তর দাও: (ক) "বড় হইলে সে তামাকের দোকান করিবে।" —কে করিবে, কেন? (খ) "ছি, এসব কি হচ্ছে শ্লেটে"—কে, কি করছিল শ্লেটের উপর?

৮. অর্থ বুঝিয়ে বলো: "বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস।"

বাতাপি রাক্ষস

—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[লেখক পরিচিতি : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (জন্ম : অগস্ট ৭, ১৮৭১ ; মৃত্যু : ডিসেম্বর ৫, ১৯৫১) নিবাস জোড়াসাঁকো, কলিকাতা। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র, গুণেন্দ্রনাথের পুত্র। চিত্রশিল্পে অবনীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল ; পরে শিল্পী হিসাবেই তিনি পৃথিবীখ্যাত হন। 'শকুন্তলা', 'ভূতপতরীর দেশ', 'নালক', 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনী', 'পথেবিপথে', 'জোড়াসাঁকোর ধারে', 'ঘরোয়া', 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী', 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ' ইত্যাদি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।]

দণ্ডক অরণ্যের একদিকে অনেক মুনিঋষির আশ্রম ছিল। আর এক-দিকে অনেক ক্রোশ জুড়ে অনেকখানি একটা বাতাপি নেবুর বন ছিল। সেই বনে দুটো অসুর ছিল—এক ভায়ের নাম ইল্বল আর এক ভায়ের নাম বাতাপি। ইল্বল একখানি পাতার কুটিরে তপস্বী সেজে বসে থাকত, আর বাতপি একটা বাতাপি নেবুর গাছ হয়ে সেই ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকত।

বর্ষার শেষে সেই নেবুর বন সবুজ পাতায়, নেবুর ফুলে, বাতাপি নেবুতে ছেয়ে যেত। কত যে পাখি কত যে ভ্রমর কত যে মধুকর

সেই বনে গান গাইত, ফুলে ফুলে উড়ে বসত, পাতার ফাঁকে চাক বাঁধত, তার আর ঠিকানা নাই। সেই সময় দক্ষিণ দিকে ঋষিদের আশ্রম থেকে দলে দলে ঋষিকুমার সেই বনে বাতাপি নেবু পাড়তে আসত। তারা সারাদিন সেই নেবুবনের তলায় কচি ঘাসে শুয়ে পাখিদের গান শুনত, নেবুফুলের মালা গাঁথত, কত খেলা খেলত, তার পর সন্ধ্যার সময় আঁচল ভরে রাশি রাশি নেবু, সুগন্ধ নেবু ফুল ঘরে নিয়ে যেত। যতদিন সেই বনে নেবু থাকত ততদিন তারা প্রতিদিন আসত, নেবু পেড়ে খেত, নেবু ফুল তুলত। অসুর ইল্বল তপস্বী সেজে বসে বসে দেখত, কিছু বলত না। তার পর যখন সব নেবু পাড়া হয়ে গেছে, বনে আর একটি গাছেও নেবু নেই, গাছের পাখি উড়ে গেছে, ফুলের ভ্রমর চলে গেছে, শীতের হাওয়ায় সবুজ পাতা ঝরে গেছে, শিশিরে ঘাস ভিজে গেছে, সেই সময় ভণ্ড তপস্বী ইল্বলের কুটির-দুয়ারে মায়াবী সেই বাতাপি নেবুর গাছ সবুজ সবুজ পাতায়, থোলো থোলো ফুলে, বড়ো বড়ো নেবুতে ছেয়ে যেত। সেই গাছে কত পাখি গান গেয়ে উঠত, কত ভ্রমর গুনগুন করে তার চারিদিকে বেড়াত। সেই সময়ে সেই ভণ্ড তপস্বী ইল্বল গুটিগুটি গিয়ে আদর করে সেই ঋষিকুমারদের হাত ধরে সেই মায়া বাতাপির তলায় যেত; পাকা-পাকা বড়ো বড়ো নেবু পেড়ে তাদের খেতে দিত, তারা মনের আনন্দে তাই খেত।

হায়, তারা তো জানত না এ ঋষি ভণ্ড ঋষি, এ ফল মায়াফল।

যখন সন্ধ্যা হয়ে আসত, বন আঁধার হত, বাপ-মায়ের কোলে ছোটো ছোটো সঙ্গীদের সঙ্গে যাবার জন্য সেই ছোটো ছোটো ঋষিকুমারদের প্রাণ আকুল হত, তখন সেই রাক্ষস ইল্বল ডেকে বলত, আয় রে বাতাপি বাহিরে আয়। অমনি সেই ঋষিকুমারদের পেট চিরে বাতাপি নেবুর ভিতর থেকে মায়াবী রাক্ষস বাতাপি বাহিরে আসত। তার পর সেই দুই অসুর মনের আনন্দে সেই ঋষিকুমারদের রক্ত পান করে, তাদের সেই বনে মাটিতে পুঁতে রাখত। এক-একটি ঋষিকুমার এক একটি নেবুগাছ হয়ে থাকত।

যারা সেই-সব গাছের নেবু খেত, তারা যেমন মানুষ তেমনি থাকত, আর যারা সেই ভণ্ড তপস্বীর কথায় ভুলে সেই মায়া গাছের মায়া ফল খেত, তাদেরি পেট চিরে রক্ত পান করে সেই দুই রাক্ষস নেবু বনে নেবু গাছ করে রাখত। এমনি করে সেই বনে কত যে নেবু গাছ হল তার আর ঠিকানা নেই। শেষে তপোবনে আর একটিও ঋষিকুমার রইল না—সেই দুই রাক্ষস সবাইকে খেয়ে ফেললে। ইল্বল, বাতাপি দেখলে বনে আর একটিও ঋষিকুমার নাই; তখন তারা সেই ঋষিদের খাবার পরামর্শ আঁটতে লাগল; সারারাত দু'জনের পাতার কুটিরে মিটমিটে আলোয় ফুসফুস পরামর্শ চলল।

শেষে ভোরবেলা ইল্বল যেমন তপস্বী ছিল তেমনি হল। আর বাতাপি ঘোরানো শিং পাকানো রোম মোটাসোটা একটা ভেড়া হল। সেই ভেড়াকে গাছে বেঁধে ভোরবেলা ইল্বল ঋষিদের আশ্রমে চলে গেল। সেখানে গিয়ে ইল্বল ঋষিদের বললে, আজ আমার বাপ-মায়ের শ্রাদ্ধ—আপনারা সবাই আমার আশ্রমে পায়ের ধুলো দেবেন।

তাঁরা মনের আনন্দে তপোবনসুদ্ধ সব ঋষি সেই দুই অসুর ইল্বল-বাতাপির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। ইল্বল আদর করে ঋষিদের আশ্রমে ডেকে নিলে—নেবুর বনে, সবুজ ঘাসে, কুশাসনে তাঁদের বসতে দিলে। তারপর বাতাপি রাক্ষস গাছের তলায় ভেড়া হয়ে বাঁধা ছিল তাকে কেটে যত্ন করে রেঁধে সেই ঋষিদের খেতে দিলে। নেবু বনে ঋষিকুমারেরা নেবু গাছ হয়েছিল, এদেরি তলায় বসে ঋষিরা বাতাপি অসুরের মাংস খেতে লাগলেন। তারা পাতা নেড়ে, ডাল দুলিয়ে ঋষিদের সেই মাংস খেতে বারণ করলে, কিন্তু ঋষিরা কিছুই বুঝতে পারলেন না; খাওয়া শেষ হলে ইল্বল ডাকলে—আয়রে বাতাপি বাহিরে আয়। অমনি সেই রাক্ষস বাতাপি দয়ার সাগর সেই ঋষিদের পেট

চিরে হাসতে হাসতে দেখা দিলে। সে বনে আর একটি মানুষ রইল না। অবশেষে শীতকাল গিয়ে বর্ষাকাল এল ; মানুষের আশায় নিরাশ হয়ে সেই দুই অসুর সেই নিঝুম নেবু বনে দিবারাত্রি মেঘের কড়মড় বৃষ্টির ঝরঝর ঝড়ের হুহু শব্দ শুনতে শুনতে যেন পাগল হয়ে উঠল। যেদিকে চায় সেইদিকেই নেবুগাছ ; এই ঘোর বনে পাতা, লতা, নেবুর কাঁটা ঠেলে মানুষ কি আসতে পারে ? কার এত সাহস। সেই দুই অসুর একেবারে হতাশ হয়ে পড়ল। এমন সময় একদিন রাক্ষসদের যম মহামুনি অগস্ত্য তীর্থ করে সেই দণ্ডক অরণ্যে এসে দেখলেন সেখানে সে তপোবন নাই, সে ঋষিরাও নাই, সেই শান্তশিষ্ট ঋষিকুমার তারাও নাই। পাতার কুটির ভেঙ্গে পড়েছে, মাটির ঘরে ফাট ধরেছে। ধানের ক্ষেত, কুশের বন, ফুলের বাগান কাঁটা গাছে ছেয়ে ফেলেছে। তপোবন যেন শ্মশান হয়েছে। এমন তপোবন কে এমন করেছে ? মহামুনি অগস্ত্য সেই কাঁটার বনে ধ্যানে বসলেন ; ঋষিদের কথা, ঋষিকুমারদের কথা, সেই দুই রাক্ষসের কথা, সব জানতে পারলেন। তখন মহামুনি অগস্ত্য এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হয়ে, লাঠি হাতে গুটিগুটি ভর সন্ধ্যাবেলা সেই বাতাপি নেবুর বনে দেখা দিলেন। বনের যত গাছ ডাল দুলিয়ে পাতা নেড়ে তাঁকে ফিরে যেতে বললে। কাঁটা-ঘেরা মোটা ডালে তাঁর পথ আগলে ধরলে। ঋষি তাদের অভয় দিলেন।

তখন সেই মানুষেরা শান্ত হল, পাতা নড়া, ডাল দোলা বন্ধ হল, কাঁটা-ঘেরা নেবুর ডাল পথ ছেড়ে দিলে—ঋষি চললেন। এতদিনে সেই বনে মানুষের গন্ধ পেয়ে সেই দুই রাক্ষসের মন চঞ্চল হয়ে উঠল। বাতাপি তখন এক ভেড়া হল, আর ইল্বল তাকে গাছে বেঁধে তপস্বী সেজে অগস্ত্য মুনির কাছে গেল। তাঁকে আদর করে ঘরে এনে কুশাসনে বসতে দিলে, হাত-পা ধুতে জল দিলে। তার পর

যত্ন করে সেই মায়া ভেড়ার মায়া মাংস কলার পাতায় গাছের তলায় সেই ঋষিকে খেতে দিলে, ঋষি খেতে লাগলেন।

রাক্ষস যত দেয় ঋষি তত খান; খাওয়া আর শেষ হয় না। শেষ যখন সব মাংস খাওয়া হল, তখন ঋষি উঠলেন। ইল্বল ডাকলে, আয় রে বাতাপি বাহিরে আয়। কিন্তু বাতাপি আর বাহিরে এল না। ইল্বল কত ডাকাডাকি করলে তবু এল না। অগস্ত্য ঋষির পেটে আগুন জ্বলছিল, তাতেই পুড়ে ছাই হয়ে গেল। রাক্ষস ইল্বল ভাই বাতাপির শোকে পাগল হয়ে উঠল; ভয়ঙ্কর নিজ-মূর্তি ধরে আকাশ পাতাল হাঁ নিয়ে রাগে ফুলতে ফুলতে অগস্ত্য ঋষিকে গিলতে চলল।

অগস্ত্য কি সামান্য ঋষি! একগণ্ডুষে সাগরের জল পান করেন, রাক্ষস কাছে আসতেই তাকে ভস্ম করে ফেললেন। রাক্ষসের পা থেকে মাথা পর্যন্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কতক ছাই হাওয়ায় উড়ে গেল, কতক ছাই জলে ধুয়ে গেল, এক মুঠা রইল। সেই ছাই মুঠা নিয়ে মহর্ষি অগস্ত্য সব নেবু গাছের তলায় ছড়িয়ে দিলেন। যে-সব ঋষিরা যে ঋষিকুমারেরা নেবু গাছ হয়ে ছিল তারা আবার যেমন মানুষ ছিল তেমনি মানুষ হল। আবার সেই কাঁটাভরা তপোবন, পাতার কুটির, মাটির ঘরে ছেয়ে গেল; ধানের ক্ষেত সোনার ধানে ভরে গেল, ফুলের বাগানে ফুল ফুটে উঠল। ঋষিকুমারেরা মনের আনন্দে সেই নেবুর বনে নেবু পেড়ে নেবুর ফুলের মালা গেঁথে মনের আনন্দে খেলে বেড়াতে লাগল; আর রাক্ষসের ভয় রইল না। (—সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

১. বাতাপি রাক্ষস গল্পটি নিজের ভাষায় লেখো।
২. তপোবন কাঁটাবনে পরিণত হলো কেন?
৩. অগস্ত্যঋষি কেমন করে রাক্ষস নিধন করলেন?
৪. নেবুবন কি সঙ্কেত করে অগস্ত্যমুনিকে বনে আসতে বাধা দিয়েছিল?
৫. মানুষবিহীন কাঁটাবনে রাক্ষসদের মনের অবস্থা কিরূপ হয়েছিল ?
৬. অর্থ লেখো: (ক) তপস্বী, (খ) মায়াবী, (গ) ভণ্ড, (ঘ) আশ্রম, (ঙ) কুশাসন, (চ) মধুপ, (ছ) গুঞ্জন, (জ) অভয়, (ঝ) গণ্ডুষ, (ঞ) মহর্ষি।

দেশাত্মবোধ

[লেখক পরিচিতি : সুভাষচন্দ্র বসু (জন্ম : জানুআরি ২৩, ১৮৯৭)— কটকের বিখ্যাত আইনজীবী জানকীনাথ বসুর পুত্র। চব্বিশ পরগনার কোদালিয়া গ্রামে পৈত্রিক নিবাস। স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে বি.এ. পাস করিয়া আই.সি.এস. পরীক্ষা দিবার জন্য ইংল্যাণ্ড গমন করেন এবং ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে এই পরীক্ষায় চতুর্থস্থান অধিকার করেন। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা করপোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা এবং পরে মেয়র নির্বাচিত হন। ১৯৩৮ এবং ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে ত্রিপুরী ও হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি হন। পরে মতভেদ হওয়ায় সুভাষচন্দ্র ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করেন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে স্বগৃহে অন্তরীণ থাকার সময় অকস্মাৎ তিনি অন্তর্হিত হন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ছাব্বিশে জানুআরি সুভাষচন্দ্র 'আজাদ-হিন্দ ফৌজ' গঠন করেন। 'তরুণের স্বপ্ন', 'ভারত পথিক' তাঁহার দুইখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।]

প্রায় দুই বৎসর হইতে চলিল আমি বিনা-বিচারে ও বিনা অপরাধে কারারুদ্ধ। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে বহু অনুরোধ করা সত্ত্বেও আমাকে গবর্নমেণ্টের কোনও আদালতের সামনে উপস্থিত করা হয় নাই। এমনকি আমার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কি অভিযোগ ও সাক্ষ্য আছে তাহাও প্রকাশ্যে অথবা জনান্তিকে আমাকে বলা

হয় নাই। আমার অপরাধ সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি যে, অপরাধ যদি কিছু করিয়া থাকি তাহা এই যে, পরাধীন জাতির সনাতন গতানুগতিক জীবনপন্থা ছাড়িয়া কংগ্রেসের একজন দীন সেবক হিসাবে স্বদেশ-সেবায় মন-প্রাণ-শরীর সমর্পণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। তারপর আমি যে শুধু কারারুদ্ধ হইয়াছি তাহা নয়, বিশ মাস হইল আমি দেশান্তরিত। বাঙলার মাটি, বাঙলার জলের পবিত্র স্পর্শ হইতে কতকাল যাবৎ আমি বঞ্চিত!

তবে আমার সান্ত্বনা ও সৌভাগ্য এই যে, আমার কারাবাস ব্যর্থ হয় নাই। আজ "আমার সকল ব্যথা রঙীন হয়ে, গোলাপ হয়ে" ফুটিয়াছে। এইখানে আসিবার পূর্বে আমি বাঙলাকে, ভারতভূমিকে ভালবাসিতাম। কিন্তু এই বিচ্ছেদের দরুন সোনার বাঙলাকে, পুণ্য ভারতভূমিকে শতগুণে ভালবাসিতে শিখিয়াছি। বাঙলার আকাশ বাঙলার বাতাস—'স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' বাঙলার মোহনীয় রূপ আজ আমার নিকট কত পবিত্র, কত সুন্দর হইয়াছে। যে আত্যন্তিক আত্মোৎসর্গের আদর্শ লইয়া আমি কর্মভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিলাম, নির্বাসনের পরশমণি আমায় দিন দিন সে মহাদানের যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। সে চিরন্তন সভ্য বাঙলার ভাগীরথী ও বাঙলার ঢেউ-খেলানো শ্যামল শস্যক্ষেত্রে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, বাঙলার যে প্রাণধর্মকে বঙ্কিম হইতে আরম্ভ করিয়া দেশবন্ধু পর্যন্ত প্রতিভাবান মনীষিগণ সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিয়া সাহিত্যের মধ্যে প্রকট করিয়াছিলেন, বাঙলার যে বিচিত্র রূপ কত শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিকের লেখনী ও তুলিকার বিষয় হইয়াছে, আজ তাহার আভাস পাইয়া আমি ধন্য হইয়াছি। এই অনুভূতির পথে আমি জীবনের যাত্রা সুরু করিয়াছি, সেই পথে শেষ পর্যন্ত চলিতে

পারিব ; অজানা ভবিষ্যৎকে সম্মুখে রাখিয়া যে ব্রত একদিন গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা উদ্‌যাপন না করিয়া বিরত হইব না। আমার সমস্ত প্রাণ ও সারা জীবনের শিক্ষা নিঙাড়িয়া আমি এই সত্য পাইয়াছি—পরাধীন জাতির সব ব্যর্থ—শিক্ষা, দীক্ষা, কর্ম—সকলই ব্যর্থ যদি তাহা স্বাধীনতা লাভের সহায় বা অনুকূল না হয়। তাই আজ আমার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে এই বাণী নিরন্তর আমার কানে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে,—"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায় ?" আমি কৃতাঞ্জলিপুটে আপনাদের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি—আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন —স্বরাজলাভের পুণ্য প্রচেষ্টাই যেন আমার জীবনের জপ, তপ ও স্বাধ্যায়, আমার সাধনা ও মুক্তির সোপান হয় এবং জীবনের শেষ দিবস পর্যন্ত আমি যেন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে নিরত থাকিতে পারি !

—সুভাষচন্দ্র বসু

অনুশীলনী

১. সুভাষচন্দ্রের অন্তরের ইচ্ছাটি নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

২. 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা'—এটি কোন্ দেশ ? —এদেশ সুভাষচন্দ্রের নিকট এতো প্রিয় কেন ?

৩. সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে এ হেন মায়ের জন্য দুঃখ ও বিপদ বরণ করা কত গৌরবের, কত সৌভাগ্যের কথা।

(খ) কিন্তু এই বিচ্ছেদের দরুন সোনার বাঙ্‌লাকে, পুণ্য ভারত-ভূমিকে শতগুণে ভালবাসিতে শিখিয়াছি।

৪. শূন্যস্থান পূর্ণ করো :

যেন আমার — জপ, তপ ও —, আমার — ও — সোপান হয় — জীবনের — — পর্যন্ত — যেন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে — থাকিতে —।

৫. অর্থ লিখ : (ক) চিরন্তন, (খ) কণ্টকময়, (গ) দীক্ষা, (ঘ) কৃতাঞ্জলিপুটে, (ঙ) স্বরাজ।

এভারেস্ট বিজয়

[লেখক পরিচিতি : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (জন্ম : জানুআরি ১৫, ১৯০৫) —জন্ম কলিকাতায়। কিশোর এবং শিশুদের জন্য বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা প্রায় ষাট। মজার গল্প, জনক জননী, সোনার ভারত, অবিস্মরণীয় মুহূর্ত, এভারেস্ট বিজয়ী তেনজিং প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' এবং মুল্ক রাজ আনন্দের 'কুলী' তাঁহার সার্থক বঙ্গানুবাদ।]

কর্নেল হান্টের নায়কত্বে তেরো জন নির্ধারিত পর্বত-আরোহী ছিলেন। এই তেরো জনের মধ্যে একজন হলেন ভারতীয়—তেনজিং, আর দু'জন হলেন নিউজিল্যাণ্ডবাসী, বাকি সকলেই ইংরেজ। তাঁদের নাম হলো, কর্নেল হাণ্ট (নায়ক), মেজর উইলি, নইস, বুর্দিলো গ্রেগরি, ব্যান্ড, ইভান্স, হিলারি, লাওয়ি, ওয়েস্টম্যাকট, ওয়ার্ড, পাফ, স্টোবার্ট ও তেনজিং।

এভারেস্ট-অভিযানের যাত্রাকেন্দ্র হলো—নেপালের রাজধানী

কাঠমাণ্ডু। এইখানেই নানা দিক থেকে অভিযাত্রীরা সকলে এসে মিলিত হন এবং এখান থেকেই কুলীদের সংগ্রহ করা হয়। আগেকার অধিকাংশ অভিযানের মতো এই অভিযানও 'অ্যালপাইন ক্লাব' আর ইংল্যাণ্ডের জগৎ-বিখ্যাত 'রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি'র যুক্ত তত্ত্বাবধানে গঠিত হয়।

ইতিমধ্যেই তেনজিং-এর কাছে আমন্ত্রণপত্র পৌঁছে গিয়েছিল। তিনি কাঠমাণ্ডুতে এসে অভিযাত্রীদের সঙ্গে যোগদান করলেন এবং প্রথমেই কর্নেল হাণ্টকে জানালেন, তিনি এই অভিযানে যোগদান করবার জন্যেই এসেছেন ; কিন্তু তাঁর একটা সর্ত আছে, সে-সর্ত মেনে না নিলে তিনি এই অভিযানে যোগদান করবেন না। সে-সর্ত হলো তাঁকে পুরোপুরি অভিযাত্রী বলে মেনে নিতে হবে এবং যদি তিনি সক্ষম হন, তা হলে তাঁকে একাই এভারেস্টের চূড়ার দিকে অগ্রসর হবার অধিকার দিতে হবে।

কাঠমাণ্ডুর ব্রিটিশ অ্যামবেসিতে এই নিয়ে সভা বসলো এবং সভায় স্থির হলো তেনজিং-এর সর্ত স্বীকার করা হবে।

সমস্ত আয়োজন শেষ হয়ে গেলে, দু-দলে অভিযানকে ভাগ করা হলো। প্রথম দলে রইলো ন'জন অভিযাত্রী, একশো বাষট্টি জন ভারবাহী আর আঠারো জন শেরপা। দ্বিতীয় দলে রইলেন স্বয়ং কর্নেল হাণ্ট আর তিনজন অভিযাত্রী, দু'শো জন ভারবাহী, আর দু'জন শেরপা। সমস্ত মালের ওজন হলো সতেরো শো পাউণ্ড।

কাঠমাণ্ডু থেকে অভিযান যাত্রা করলো নামচে বাজারের দিকে —কাঠমাণ্ডু থেকে একশো সত্তর মাইল দূর এই নামচে বাজার থেকে প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় আসল অভিযান। এই একশো সত্তর

মাইল পথ এতো দুরূহ আর দুর্গম যে, অভিজ্ঞ নেপালী শেরপারা ছাড়া এই পথ দিয়ে কেউ অগ্রসর হতে পারে না। অন্য পথ দিয়ে অবশ্য নামচে বাজারে পৌঁছনো যায়, কিন্তু তাতে সময় লাগে ঢের বেশি।

থায়াংবকে এক বৌদ্ধ মঠ আছে। ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়, হিমালয়ের এই দূর-দুর্গমতার মধ্যে এই অনন্ত তুষারের রাজ্যেও সর্বত্র মঠ-মন্দির আছে, আর সেই মঠ ও মন্দিরে যুগ-যুগান্ত ধরে ইষ্টের আরাধনা চলেছে।

থায়াংবক মঠের বৌদ্ধ শ্রমণেরা অভিযাত্রীদের আশীর্বাদ করলেন।

থায়াংবক মঠের সামনে থেকেই শুরু হয়েছে বিশাল খুম্বু গ্লেসিয়ার বা হিমবাহ। এই হিমবাহ পেরিয়ে অগ্রসর হতে হবে। এইখান থেকেই বাতাস খুব পাতলা হয়ে আসে। তাই এখানে কয়েক দিন বাস করে এই পাতলা বাতাসকে সহ্য করে নিতে হয়।

আটাশে তেনজিং আর হিলারি সাত নম্বর তাঁবু থেকে যাত্রা করলেন। তাঁরা ঠিক করলেন, সোজা এভারেস্টের চূড়ার দিকে অগ্রসর না হয়ে, তাঁরা যতো উঁচুতে পারেন, এমনভাবে আট নম্বর তাঁবু ফেলবেন যাতে করে রাত্রির বিশ্রামের পর পরের দিন সকালবেলা তাঁরা শেষ তিনশো কি সাড়ে-তিনশো ফুট জয় করে ফিরে আসতে পারেন।

কিন্তু সেই পাহাড়ের গায়ে কোথাও একটা তাঁবু ফেলবার মতো সামান্য জায়গাও পাওয়া গেল না। গত বছর তেনজিং সুইস-অভিযাত্রীদের সঙ্গে এই পথেই এসেছিলেন ; সেই সময় তিনি একটা জায়গা লক্ষ্য করেছিলেন। বহু খোঁজাখুঁজির পর তেনজিং সেই

জায়গা বার করলেন এবং সাতাশ হাজার আটশো ফুটে আট নম্বর তাঁবু ফেলা হলো।

এর আগে এতো উঁচুতে আর কোনো তাঁবু ফেলা হয়নি। এই তাঁবুতে কোনো রকমে একজন মানুষ ধরে। তাই থাকের মতন করে তেনজিং আর হিলারি সেই ছোট্টো তাঁবুতে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করলেন। সঙ্গে যে সাহায্যকারী দল এসেছিল তারা ফিরে গেল। তেনজিং আর হিলারি সেই তুষার-নীড়ে কম্পিতবুকে রাত-প্রভাতের অপেক্ষায় রইলেন।

উনত্রিশে ভোর ছ'টা বাজতেই তেনজিং আর হিলারি শেষ অভিযানের জন্যে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ন'টার সময় তাঁরা দক্ষিণ চূড়ায় এসে উঠলেন, সেখান থেকে এভারেস্টের মূল চূড়া হলো আর আধ-মাইল মাত্র। সেখানে এসে মিনিট দশেক তাঁরা একটু বিশ্রাম করে নিলেন। মুখ থেকে অক্সিজেন নেবার মুখোসটা খুলে ফেললেন, দেখলেন বিশেষ কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

অক্সিজেন-যন্ত্রের দিকে চেয়ে তারা ভীত হয়ে ওঠেন। যেটুকু অক্সিজেন আছে, তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়! স্বাভাবিক মাত্রায় যদি নেওয়া হয় তা হলে চূড়ায় পেঁছিতে না পেঁছিতেই ফুরিয়ে যাবে, তখন হিসেব করে তাঁরা অক্সিজেনের মাত্রা কমিয়ে দিলেন। তাতে অবশ্য নিঃশ্বাস নিতে একটু অসুবিধা হতে লাগলো। কিন্তু দুর্জয় পণ যাঁদের মনে, তাঁরা সব অসুবিধার ওপর দিয়ে দাঁড়াতে পারেন।

সেখান থেকে সেই আধ-মাইল পথ অতিক্রম করতে আড়াই ঘণ্টা লাগলো। সাড়ে এগারোটার সময় তেনজিং এভারেস্টের চূড়ায় গিয়ে উঠলেন, তারপর হিলারিকে হাত বাড়িয়ে উপরে তুলে

নিলেন। পঞ্চাশ বছর ধরে মানুষের অবিরাম অবিশ্রান্ত সাধনা সেদিন জয়যুক্ত হলো।

এভারেস্টের চূড়ায় কে প্রথম উঠেছিলেন, এই নিয়ে বহু বাদানুবাদ হয়। এ কথা নিঃসন্দেহ যে তেনজিংই প্রথম এভারেস্টের চূড়ায় পদার্পণ করেন।

চূড়ায় পদাপর্ণ করে তেনজিং নতজানু হয়ে ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করলেন—সঙ্গে যে চকোলেট আর বিস্কুট ছিলো, তারই অর্ঘ্য মাটিতে রেখে ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করলেন।

তারপর নেপাল আর ভারতের পতাকা সেখানে পুঁতলেন। ভারতের পতাকা তাঁকে কোনো ভারতীয় নেতা বা ভারত রাষ্ট্রের প্রতিনিধি দেন নি, তাঁর এক বাঙালী বন্ধু একটি ছোটো ত্রিবর্ণ পতাকা তাঁর হাতে দেন। বন্ধুর দেওয়া সেই ছোটো পতাকাটুকু রাখলো ভারত রাষ্ট্রের সম্মান।

—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

অনুশীলনী

১. "এভারেস্ট অভিযান" বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখো।
২. (ক) এভারেস্ট শৃঙ্গে কে প্রথম পদার্পণ করেন? (খ) তেনজিংকে ভারতের পতাকা কে দিয়েছিল? (গ) এই অভিযানের কে নায়ক ছিলেন? (ঘ) এই যাত্রা কোথা হতে শুরু হয়?
৩. এই অভিযানে অক্সিজেন একান্ত প্রয়োজন হয় কেন?
৪. তেনজিং কাঠমাণ্ডুতে এসে অভিযাত্রী দলের কাছে কি সর্ত রাখলেন?
৫. কর্ণেল হাণ্টের নায়কত্বে যে তেরোজন নির্ধারিত পর্বতারোহী ছিলেন তাঁদের নাম লেখো।
৬. অর্থ লেখো এবং বাক্য রচনা করো: পর্যাপ্ত, দুর্জয়, অবিশ্রান্ত, পদার্পণ স্মরণ।
৭. শূন্যস্থান পূরণ করো: (ক) পঞ্চাশ বছর ধরে — অবিরাম — সাধনা সেদিন — হলো। (খ) সঙ্গে যে — আর বিস্কুট ছিলো তারই — মাটিতে রেখে — নিবেদন করলেন।

[কবি পরিচিতি : কৃত্তিবাস ওঝা (জন্ম : আনুমানিক ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দ)— নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরের ফুলিয়ায় কৃত্তিবাসের জন্ম। পিতার নাম বনমালী, পিতামহ মুরারী ওঝা। একাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে কবি বিদ্যার্জনের জন্য উত্তরদেশে গমন করেন। বিদ্যাসমাপনান্তে কবি জনৈক হিন্দু রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা করেন। এই রাজা সম্ভবত রাজশাহীর রাজা গণেশ (১৪১৪-১৪১৮)। কবি প্রায় আশি বৎসর কাল জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়।]

গোলোক বৈকুণ্ঠ-পুরী সবার উপর।
লক্ষ্মীসহ তথায় আছেন গদাধর ॥
সেখানে অদ্ভুত বৃক্ষ দেখিতে সুচারু।
যাহা চাই, তাহা পাই. নাম কল্পতরু ॥
দিবা-নিশি তথা চন্দ্র-সূর্যের প্রকাশ।
তার তলে আছে দিব্য বিচিত্র আবাস ॥
নেতপাট সিংহাসন-উপরেতে তুলি'।
বীরাসনে আছেন বসিয়া বনমালী ॥
মনে মনে প্রভুর হইল অভিলাষ।
এক-অংশে চারি-অংশ হইব প্রকাশ ॥

শ্রীরাম ভরত আর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ।
এক-অংশে চারি-অংশ হইলা নারায়ণ॥
লক্ষ্মীমূর্তি-সীতাদেবী বসেছেন বামে।
স্বর্ণ-ছত্র ধরেছেন লক্ষ্মণ শ্রীরামে॥
ভরত শত্রুঘ্ন তাঁরে ঢুলান চামর।
হনুমান স্তব করে যুড়ি দুই কর॥
এইরূপে বৈকুণ্ঠে আছেন গদাধর।
হেনকালে চলিলা নারদ মুনিবর॥
বীনা যন্ত্র হাতে করি হরিগুণ গান।
উত্তরিলা গিয়া মুনি প্রভু-বিদ্যমান॥
রূপ দেখি বিহ্বল নারদ চান ধীরে।
বসন তিতিল তাঁর নয়নের নীরে॥

—কৃত্তিবাস ওঝা

অনুশীলনী

১. নারায়ণ কি কি নামে চারি অংশে প্রকাশ পাইলেন?
২. বাঙ্‌লা ভাষায় প্রথম অনূদিত মহাকাব্যের নাম লিখ।
৩. সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ:
রূপ দেখি বিহ্বল নারদ চান ধীরে।
বসন তিতিল তাঁর নয়নের নীরে॥
৪. শব্দার্থ লিখ: সুচারু, আবাস, অভিলাষ, নীরে।

[কবি পরিচিতি ঃ কাশীরাম দাস—আবির্ভাব-কাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষ-ভাগে। নিবাস বর্ধমান জেলায় সিঙ্গি গ্রামে। পিতার নাম কমলাকান্ত। কাশীরাম দাসের মহাভারত সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রচিত। প্রবাদ আছে কাশীরাম আদি, সভা, বন ও বিরাটপর্ব পর্যন্ত রচনা করিয়াছিলেন।]

অবন্তীনগরে দ্বিজ ছিল একজন।
তাঁর স্থানে শিষ্যগণ করে অধ্যয়ন ॥
আরুণি নামেতে শিষ্য ছিল একজন।
ডাকি তারে গুরু আজ্ঞা কৈল ততক্ষণ ॥
ধান্যক্ষেত্রে জল সব যাইছে বহিয়া।
যত্ন করি আলি বাঁধি জল রাখ গিয়া ॥
আজ্ঞামাত্র আরুণি যে করিল গমন।
আলি বাঁধিবারে বহু করিল যতন ॥
দন্তেতে খুদিয়া মাটী বাঁধে লয়ে ফেলে।
রাখিতে না পারে মাটী অতি বেগ জলে ॥
পুনঃপুনঃ শিষ্যবর করিল যতন।
নারিল ক্ষেত্রের জল করিতে বন্ধন ॥

জল বহি যায়, গুরু পাছে ক্রোধ করে।
আপনি শুইল দ্বিজ বাঁধের উপরে ॥
সমস্ত দিবস গেল হইল রজনী।
না আইল শিষ্য, দ্বিজ চলিল আপনি ॥
ক্ষেত্র-মধ্যে গিয়া ডাক দিল দ্বিজবর।
শিষ্য বলে, শুয়ে আছি বাঁধের উপর ॥
বহু যত্ন করিলাম, না রহে বন্ধন।
আপনি শুইনু বাঁধে তাহার কারণ ॥
শুনিয়া বলিল গুরু, এস হে উঠিয়া।
শীঘ্র আসি গুরু-পায় প্রণমিল গিয়া ॥
আশিস্ করিয়া গুরু, করিল কল্যাণ।
চারিবেদ ষট্‌শাস্ত্রে হোক তব জ্ঞান ॥
এত বলি বিদায় করিল দ্বিজবর।
প্রণাম করিল শিষ্য গেল নিজ ঘর ॥

—কাশীরাম দাস

অনুশীলনী

১. আরুণির গুরুভক্তি সম্পর্কে কি জানো ?
২. "চারিবেদ ষট্‌শাস্ত্রে হোক তব জ্ঞান"—কে কাহাকে এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন ?
৩. সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ :
   (ক) পুনঃ পুনঃ শিষ্যবর করিল যতন।
   নারিল ক্ষেত্রের জল করিতে বন্ধন ॥
   (খ) ক্ষেত্র-মধ্যে গিয়া ডাক দিল দ্বিজবর।
   শিষ্য বলে, শুয়ে আছি বাঁধের উপর ॥
৪. শব্দার্থ লিখ : প্রণমিল, রজনী, অধ্যয়ন, নারিল, চারিবেদ।

[**কবি পরিচিতি ঃ** মাইকেল মধুসূদন দত্ত (জন্ম ঃ জানুআরি ২৫, ১৮২৪ ; মৃত্যু ঃ জুন ২৯, ১৮৭৩)—নিবাস সাগরদাঁড়ি, যশোহর। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন তৎকালীন অভিজাত ব্যক্তি। ছাত্রাবস্থায় মধুসূদন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে 'শর্মিষ্ঠা নাটক', 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'পদ্মাবতী নাটক', 'কৃষ্ণকুমারী নাটক', 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' প্রকাশিত হয়। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে তিনি চতুর্দশপদী কবিতাবলী রচনা করেন।]

রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে ;—
"শুন মোর কথা, ধনি, নিন্দ বিধাতারে !
নিদারুণ তিনি অতি নাহি দয়া তব প্রতি ;
তেঁই ক্ষুদ্র-কায়া করি সৃজিল তোমারে !
মলয় বহিলে হায়, নতশিরা তুমি তায়,
মধুকর-ভরে তুমি পড় লো ঢলিয়া ;
হিমাদ্রি সদৃশ আমি, বন-বৃক্ষ কুল-স্বামী,
মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া !
কালাগ্নির মত তপ্ত তপন তাপন,—
আমি কি লো ডরাই কখন ?
দূরে রাখি গাভী-দলে রাখাল আমার তলে
বিরাম লভয়ে অনুক্ষণ,—
শুন, ধনি, রাজ-কাজ দরিদ্র পালন !
আমার প্রসাদ ভুঞ্জে পথ-গামী জন।

কেহ অন্ন রাঁধি খায় কেহ পড়ি নিদ্রা যায়
এ রাজ চরণে।
শীতলিয়া মোর ডরে সদা আসি সেবা করে
মোর অতিথির হেথা আপনি পবন।
মধু-মাখা ফল মোর বিখ্যাত ভুবনে!
তুমি কি তা জাননা, ললনে?
দেখ মোর ডাল-রাশি, কত পাখী বাঁধে আসি
বাসা এ আগারে!
ধন্য মোর জনম সংসারে!
কিন্তু তব দুঃখ দেখি নিত্য আমি দুখি;
নিন্দ বিধাতায় তুমি নিন্দ বিধুমুখি!"
নীরবিলা তরুরাজ; উড়িল গগনে
যমদূতাকৃতি মেঘ গম্ভীর স্বননে,
আইলেন প্রভঞ্জন, সিংহনাদ করি ঘন,
যথা ভীম ভীমসেন কৌরব-সমরে।
মহাঘাতে মড়মড়ি রসাল ভূতলে পড়ি,
হায়, বায়ুবলে
হারাইলা আয়ু-সহ দর্প বনস্থলে!
উর্দ্ধশির যদি তুমি কুল মান ধনে;
করিও না ঘৃণা তবু নীচশির জনে!

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

অনুশীলনী

১. রসাল স্বর্ণলতিকাকে কি বলিয়াছিল?
২. রসালের শেষ পরিণতির বর্ণনা লিখ।
৩. সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ:
   (ক) উর্দ্ধশির যদি তুমি কুল মান ধনে;
   করিও না ঘৃণা তবু নীচশির জনে!
   (খ) আইলেন প্রভঞ্জন, সিংহনাদ করি ঘন,
   যথা ভীম ভীমসেন কৌরব-সমরে।
৪. শব্দার্থ লিখ: সৃজিল, ভেদিয়া, শীতলিয়া, নিন্দ, প্রভঞ্জন।

[কবি-পরিচিতি ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— 'জাপান' প্রবন্ধের লেখক-পরিচিতি দ্রষ্টব্য।]

আমি যদি দুষ্টুমি করে
চাঁপার গাছে চাঁপা হয়ে ফুটি,
ভোরের বেলা, মা গো, ডালের 'পরে
কচি পাতায় করি লুটোপুটি—
তবে তুমি আমার কাছে হারো—
তখন কি, মা, চিনতে আমায় পারো ?
তুমি ডাকো, 'খোকা কোথায় ওরে'
আমি শুধু হাসি চুপটি করে॥

যখন তুমি থাকবে যে কাজ নিয়ে
সবই আমি দেখব নয়ন মেলে।
স্নানটি করে চাঁপার তলা দিয়ে
আসবে তুমি পিঠেতে চুল ফেলে—
এখান দিয়ে পূজোর ঘরে যাবে,
দূরের থেকে ফুলের গন্ধ পাবে ;
তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে
তোমার খোকার গায়ের গন্ধ আসে॥

দুপুরবেলা মহাভারত হাতে
বসবে তুমি সবার খাওয়া হলে,
গাছের ছায়া ঘরের জানালাতে
পড়বে এসে তোমার পিঠে কোলে।
আমি আমার ছোট্ট ছায়াখানি
দোলাব তোর বইয়ের 'পরে আনি—
তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে
তোমার চোখে খোকার ছায়া ভাসে॥
সন্ধ্যেবেলায় প্রদীপখানি জ্বেলে
যখন তুমি যাবে গোয়াল ঘরে,
তখন আমি ফুলের খেলা খেলে
টুপ্ করে, মা পড়ব ভুঁয়ে ঝরে।
আবার আমি তোমার খোকা হব,
'গল্প বলো' তোমায় গিয়ে কব।
তুমি বলবে, 'দুষ্টু, ছিলি কোথা?'
আমি বলব, 'বলব না সে কথা।'

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুশীলনী

১. 'লুকোচুরি' কবিতাটির নামকরণ কি যথাযথ হয়েছে?
২. খোকার বিভিন্ন ইচ্ছার অভিব্যক্তিগুলি বর্ণনা করো।
৩. সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লেখো:
 (ক) আমি আমার ছোট্ট ছায়াখানি
 দোলাব তোর বইয়ের 'পরে আনি—
 (খ) তুমি বলবে 'দুষ্টু, ছিলি কোথা?
 আমি বলব, 'বলব না সে কথা।'
৪. নিচের শব্দগুলির সাহায্যে বাক্য গঠন করো:
দুষ্টুমি, লুটোপুটি, নয়ন, মহাভারত, ছায়া।

[কবি-পরিচিতি : সুনির্মল বসু (জন্ম : জুলাই ২০, ১৯০২ ; মৃত্যু : ১৯৫৭) —গিরিডিতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় একশোটিরও বেশি গ্রন্থের রচয়িতা। দোলা, টুনটুনির গান, কিপ্টে ঠাকুর্দা, ইস্তিবিস্তির আসর, কিশোর আবৃত্তি প্রভৃতি তাঁহার উল্লেখযোগ্য শিশু ও কিশোর রচনা।]

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
উদার হতে ভাইরে,
কর্মী হবার মন্ত্র আমি
বায়ুর কাছে পাই রে।
পাহাড় শিখায়—তাহার সমান,
হই যেন ভাই মৌন মহান,
খোলা মাঠের উপদেশে
দিল্-খোলা হই তাই রে।

সূর্য আমায় মন্ত্রণা দেয়—
আপন তেজে জ্বলতে
চাঁদ শিখাল—হাসতে মেদুর,
মধুর কথা বলতে।

ইঙ্গিত তার শিখায় সাগর
অন্তর হোক্ রত্ন-আকর,
নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম
আপন বেগে চলতে।

মাটির কাছে সহিষ্ণুতা
পেলাম আমি শিক্ষা.
আপন কাজে কঠোর হ'তে
পাষাণ দিল দীক্ষা।

ঝরনা তাহার সহজ গানেই
গান জাগাল আমার প্রাণেই,
শ্যাম-বনানী সরসতা
আমায় দিল ভিক্ষা।

বিশ্ব-জোড়া পাঠশালা মোর
সবার আমি ছাত্র ;
নানান ভাবের নতুন জিনিস
শিখছি দিবারাত্র।

এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়,
পাঠ্য যে সব পাতায় পাতায়,
শিখছি সে সব কৌতূহলে,
সন্দেহ নাই মাত্র।

—সুনির্মল বসু

অনুশীলনী

১. 'সবার আমি ছাত্র' কবিতাটির মূল বক্তব্যটি লিপিবদ্ধ করো।
২. 'বিশ্বজোড়া পাঠশালা' থেকে কি কি শিক্ষা পেয়েছেন ?
৩. প্রসঙ্গ নির্দেশপূর্বক ব্যাখ্যা লেখো :
   (ক) সূর্য আমায় মন্ত্রণা দেয়… …..মধুর কথা বলতে।
   (খ) এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়…… সন্দেহ নাই মাত্র।
৪. শব্দগুলির পদ পরিবর্তন করো : শিক্ষা, কর্মী, মহান, কঠোর।

কাজলাদিদি

[কবি-পরিচিতি : যতীন্দ্রমোহন বাগচী (জন্ম : নভেম্বর ২৭, ১৮৭০ ; মৃত্যু : ফেব্রুআরি ১, ১৯৪৮) নদীয়া জেলার জমসেরপুরের বিখ্যাত জমিদার বংশে জন্ম। রবীন্দ্রোত্তর যুগের অসামান্য কবি। রেখা, লেখা, অপরাজিতা, জাগরণী, নীহারিকা, পাঞ্চজন্য, রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য প্রভৃতি তাঁহার রচিত কাব্য ও গদ্যগ্রন্থ।]

বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই ;
মাগো আমার শোলোক বলা কাজলা দিদি কই ?

পুকুর ধারে লেবুর তলে, থোকায় থোকায় জোনাই জ্বলে
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, একলা জেগে রই ;
মাগো আমার শোলোক-বলা কাজলা দিদি কই ?
সেদিন হ'তে কেন মা আর দিদিরে নাহি ডাকো,
দিদির কথায় আঁচল দিয়ে মুখটি কেন ঢাকো ?

খাবার খেতে আসি যখন দিদি বলে ডাকি তখন,
ও ঘর থেকে কেন মা আর দিদি আসে নাকো ?
আমি ডাকি—তুমি কেন মা চুপটি করে থাকো ?
বল মা দিদি কোথায় গেছে, আসবে আবার কবে ?
কাল যে আমার নতুন ঘরে পুতুল বিয়ে হবে।

দিদির মত ফাঁকি দিয়ে, আমিও যদি লুকাই গিয়ে
তুমি তখন একলা ঘরে কেমন ক'রে রবে ?
আমিও নাই, দিদিও নাই—কেমন মজা হবে।

ভুঁই-চাঁপাতে ভ'রে গেছে শিউলি গাছের তল,
মাড়াসনে মা পুকুর থেকে আনবি যখন জল।
ডালিম গাছের ফাঁকে ফাঁকে বুলবুলিটি লুকিয়ে থাকে
উড়িয়ে তুমি দিও না মা ছিঁড়তে গিয়ে ফল ;
দিদি এসে শুনবে যখন, বলবে কি মা বল ?
বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই।
এমন সময় মাগো আমার কাজলা দিদি কই ?

লেবুর তলে পুকুর পাড়ে, ঝিঁ ঝিঁ ডাকে ঝোপে ঝাড়ে,
লেবুর গন্ধে ঘুম আসে না তাইত জেগে রই !
রাত্রি হ'ল মাগো আমার কাজলা দিদি কই ?

—যতীন্দ্রমোহন বাগচী

অনুশীলনী

১. 'বল মা দিদি কোথায় গেছে, আসবে আবার কবে ?'
—'কাজলা দিদি'র কথায় মায়ের নিরুত্তরের কারণ কি ?
২. দিদি-হারা শিশুটির মনোবেদনার পরিচয় দাও।
৩. সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লেখো :
(ক) আমিও নাই দিদিও নাই—কেমন মজা হবে।
(খ) লেবুর গন্ধে ঘুম আসে না তাইত জেগে রই !
রাত্রি হ'ল মাগো আমার কাজলা দিদি কই ?
৪. শব্দগুলির অর্থ লেখো :
শোলোক, জোনাই, ভুঁইচাঁপা, বুলবুলি, ঝিঁঝিঁ।

[**কবি-পরিচিতি ঃ** কামিনী রায় (জন্ম ঃ অক্টোবর ১২, ১৮৪৬ ; মৃত্যু ঃ সেপ্টেম্বর ২৭, ১৯৩৩)—নিবাস বরিশাল জেলায় বাসণ্ডায়। পিতা চণ্ডীচরণ সেন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে বি.এ. পাস করেন এবং বেথুন স্কুলে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। স্ট্যাট্যুটরি সিভিলিঅন কেদারনাথ রায়ের সহিত কামিনী দেবীর বিবাহ হয়। 'আলো ও ছায়া', 'মাল্য ও নির্মাল্য', 'দীপ ও ধূপ', 'অশোক সংগীত', 'জীবন পথে' প্রভৃতি তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা।]

করিতে পারিনা কাজ,
সদা ভয় সদা লাজ,
সংশয়ে-সংকল্প সদা টলে
পাছে লোকে কিছু বলে !

আড়ালে আড়ালে থাকি
নীরবে আপনা ঢাকি,
সম্মুখে চরণ নাহি চলে,
পাছে লোকে কিছু বলে !

হৃদয়ে বুদবুদ মত
উঠে শুভ্র চিন্তা কত,
মিশে যায় হৃদয়ের তলে
পাছে লোকে কিছু বলে !

কাঁদে প্রাণ যবে, আঁখি
সযতনে শুষ্ক রাখি,
নিরমল নয়নের জলে,
পাছে লোকে কিছু বলে !

একটা স্নেহের কথা
প্রশমিতে পারে ব্যথা—
চলে যাই উপেক্ষার ছলে,
পাছে লোকে কিছু বলে !

মহৎ উদ্দেশ্য যবে,
এক সাথে মিলে সবে,
পারি না মিলিতে সেই দলে,
পাছে লোকে কিছু বলে !

বিধাতা দেছেন প্রাণ,
থাকি সদা ম্রিয়মাণ,
শক্তি মরে ভীতির কবলে,
পাছে লোকে কিছু বলে !

—কামিনী রায়

অনুশীলনী

১. 'পাছে লোকে কিছু বলে'—কবিতাটির ভাবার্থ নিজের ভাষায় লিখ।
২. সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) সংশয়ে-সংকল্প সদা টলে
পাছে লোকে কিছু বলে !

(খ) শক্তি মরে ভীতির কবলে,
পাছে লোকে কিছু বলে !

[কবি-পরিচিতি : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (জন্ম : ফেব্রুআরি ১২, ১৮৮২ ; মৃত্যু : জুন ২৫, ১৯২২)—নিবাস চুপী, বর্ধমান। পিতামহ প্রখ্যাত সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্ত, পিতা রজনীনাথ। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ছন্দরসিক কবি। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে মাত্র অষ্টাদশ বৎসর বয়স্ক কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সবিতা' প্রকাশিত হয়। আধুনিক বাংলা কবিতায় বিভিন্ন ছন্দের প্রবর্তন করিয়া 'ছন্দের যাদুকর' আখ্যায় ভূষিত হন। বিদেশী কবিতা অনুবাদেও তাঁহার দক্ষতা, ছিল অপরিসীম। রচিত কাব্যগ্রন্থ 'বেণু ও বীণা', 'হোমশিখা', 'তীর্থসলিল', 'ফুলের ফসল', 'কুহু ও কেকা' ইত্যাদি।]

মধুর চেয়েও আছে মধুর,—
সেই আমাদের দেশের মাটি,
আমার দেশের পথের ধূলা
খাঁটি-সোনার চাইতে খাঁটি।
চন্দনেরই গন্ধে ভরা—
শীতল-করা, ক্লান্তি-হরা—
যেখানে তার অঙ্গ রাখি
সেখানটিতেই শীতল-পাটি!

শিয়রে তার সূর্য এসে
সোনার কাঠি ছোঁয়ায় হেসে ;
নিদ্-মহলে জ্যোৎস্না নিতি
বুলায় পায়ে রূপার কাঠি !

নাগের বাঘের পাহারাতে,
হচ্ছে বদল দিনে রাতে,
পাহাড় তারে—আড়াল করে,
সাগর যে তার ধোয়ায় পা'টি !
মউল ফুলের মাল্য মাথায়,
লীলার কমল গন্ধে মাতায়,
পায় জোরে তার লবঙ্গ-ফুল,
আছে বকুল আর দোপাটি।
নারিকেলের গোপন কোষে
অন্ন-পানি যোগায় গো সে,
কোল-ভরা তার কনক ধানে
আটটি শীষে বাঁধা আঁটি।
মধুর চেয়েও আছে মধুর –
সে এই আমাদের দেশের মাটি।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

অনুশীলনী

১. 'দেশ'-এর রূপটি নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।
২. আমার দেশের মাটি 'মধুর চেয়েও মধুর' কেন ?
৩. 'নাগের বাঘের পাহারাতে'—কথার অর্থ কি ?
৪. সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লেখো : মধুর চেয়েও আছে মধুর,—
সে এই আমাদের দেশের মাটি।

[কবি-পরিচিতি ঃ যতীন্দ্রমোহন বাগচী—কজলা দিদি দ্রষ্টব্য।]

তুমি আমায় বকছ কেন, মা।
আজকে আমার ঘুম যে আসে না—
    ঘুমাই কেমন করে' ?
কি সব কথাই মনে যে, মা, আসে—
এইখানেতে বাবা শুতেন পাশে,
    গলাটি মোর ধরে'।
আচ্ছা—মা, ঐ কালো ঘোড়ায় চড়ে'
কোথায় গেলেন ? যদি, মা, যান পড়ে'—
    ঘোড়া যে বজ্জাত !
বল্ না মাগো—কস্‌নে কেন কথা ?
খেলেন কোথায়, শুলেনই বা কোথা—
    এখন যে, মা—রাত !

বাহির-দোরে কে ঠেলে ঐ আগল—
এরি মধ্যে ফিরে' আসবে ? পাগল !
বকতে আমি পারিনে রাত-ভোর,
পোড়া চোখে ঘুম কেন নেই তোর ?

আচ্ছা মা—ঘুম কোথা থেকে আসে ?
দিনে বুঝি লুকিয়ে থাকে, মা সে ?
কোথায় ঘুমের বাড়ি ?
সবাই রাতে ঘুমায়—ঘুম ত' মেলা !
কাদের সাথে তাদের মা আজ খেলা—
আমার বুঝি 'আড়ি' !
ঝিঁ ঝিঁ-দেরও আড়ি, তাইতে ডাকে,
সারারাত মা জেগে তারা থাকে—
শুধু বাজনা বাজায়,
জোনাক পোকাও ঘুমায় না মা, রাতে,
রোজই বিয়ে হয় মা, কাদের সাথে—
রোজই আলো সাজায় ?
তোর সাথে আর বকতে পারিনি—
পোড়া চোখে ঘুমের হ'ল কি ?
তোরও মা,—আজ কি হয়েছে যেন !
রোজ কথা কস্—আজকে এমন কেন ?

—যতীন্দ্রমোহন বাগচী

অনুশীলনী

১. খোকার চোখে ঘুম আসে না কেন ? খোকার বাবা কোথায় গেছেন ?
২. সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লেখো : তোরও মা,—আজ কি হয়েছে যেন !
রোজ কথা কস্—আজকে এমন যেন ?
৩. ঘুমহারা কবিতাটির মর্মার্থ লেখো।

কামনা

[কবি-পরিচিতি : হুমায়ুন কবির (জন্ম : ফেব্রুআরি ২২, ১৯০৬ ; মৃত্যু : ১৯৬৯)—পৈতৃক নিবাস বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত ফরিদপুর জেলায়। কলিকাতা ও অকস্‌ফোরড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। ১৯৩৩-৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তিনি কুড়িটিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। স্বপ্ন-সাধ, সাথী, বাংলায় কাব্য, ইংলিশ : পোয়েট্রি, মহাত্মা অ্যাণ্ড আদার পোয়েম্‌স প্রভৃতি তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।]

হে মোর দেবতা, প্রভু, মম চিত্ত মাঝে
প্রকাশিত হও তব মহিমার সাজে।
ব্যথা দিয়ে, দুঃখ দিয়ে হিয়ারে আমার
আঘাতে আঘাতে কর মহৎ, উদার।
শক্তি মোরে দাও প্রভু, যেন চিত্তে মম
মানবে বরিতে পারি মোর ভ্রাতা সম !
শত্রুমিত্র ভেদাভেদ ভুলি' যেন, নাথ,
কল্যাণে মিলিতে পারি সকলের সাথ।

দারিদ্র্য, কেন সে রবে ? কেন অত্যাচার
তোমার দয়ার রাজ্যে ? কেন অবিচার
সুন্দর ভুবনে তব ? হে আমার প্রভু,
প্রেমমাঝে হিংসা কেন জেগে রয় তবু ?
দূর কর, দূর কর সর্ব আবর্জনা,
সকলের হ'য়ে মাগি তোমারি মার্জনা।

—হুমায়ুন কবির

অনুশীলনী

১. কবিতাটির সারাংশ নিজের ভাষায় লিখ।

২. কবি দেবতার নিকটে কি প্রার্থনা করিতেছেন—তাহা নিজের ভাষায় লিখ।

৩. সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) শক্তি মোরে দাও প্রভু, যেন চিত্তে মম
মানবে বরিতে পারি মোর ভ্রাতা সম !

(খ) দূর কর, দূর কর সর্ব আবর্জনা,
সকলের হ'য়ে মাগি তোমারি মার্জনা।

৪. অর্থ লিখ : চিত্ত, মহিলা, আবর্জনা, মার্জনা।

[**কবি-পরিচিতি ঃ** মানকুমারী বসু (জন্ম ঃ ১৮৬৩ ; মৃত্যু ঃ ১৯৪৩)—যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম 'ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক' লাভ করেন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' পুরস্কারে সম্মানিত করেন। কনকাঞ্জলি, সোনার সাথী, কাব্য-কুসুমাঞ্জলি প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রসিদ্ধ।]

আমি চাই বীরত্বের তেজস্বী পরাণ।
পায়ে ঠেলে তোষামোদে নীচতার অনুরোধে
তার ব্রত—সত্যরক্ষা, সত্যানুসন্ধান ;
চাহে না নিজের ইষ্ট অতুল কর্তব্যনিষ্ঠ
ধরা প্রতিকূল হ'লে নহে কম্পমান ;
জীবন-সংগ্রামে নিত্য বিজয়ী তাহার চিত্ত
অনন্তে উড়িছে তার বিজয়-নিশান।
আমি চাই বীরত্বের তেজস্বী পরাণ॥

অনুশীলনী

১. কবিতাটির মর্মার্থ নিজের ভাষায় প্রকাশ করো।

২. সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) পায়ে ঠেলে তোষামোদে নীচতার অনুরোধে
তার ব্রত—সত্যরক্ষা, সত্যানুসন্ধান ;

(খ) জীবন-সংগ্রামে নিত্য বিজয়ী তাহার চিত্ত
অনন্তে উড়িছে তার বিজয়-নিশান।

৩. পদ-নির্ণয় করো : বীরত্ব, তোষামোদ, নীচতা, অনুরোধ, ব্রত, প্রতিকূল, বিজয়ী।

৪. শূন্যস্থান পূর্ণ করো : "চাহে না নিজের — অতুল — ধরা — হ'লে নহে — ;

৫. বাক্যে প্রয়োগ করো : তেজস্বী, তোষামোদ, অতুল, প্রতিকূল।

৬. বিপরীত শব্দ লিখ : ইষ্ট কর্তব্যনিষ্ঠ, প্রতিকূল, অনন্ত।

৭. লিঙ্গান্তর করো : বীর, তেজস্বী, বিজয়ী।

পরিশিষ্ট

মৌখিক প্রশ্ন

কমলাকান্তের দপ্তর ঃ ১. কমলাকান্ত ইংরেজি, সংস্কৃত জানা সত্ত্বেও লোকে তাকে পাগল বল্‌তো কেন? ২. লেখকের মতে পণ্ডিত বা গণ্ডমূর্খ কারা? ৩. সেক্সপীয়র কে ছিলেন? ৪. কমলাকান্ত পে-বিলে কি এঁকেছিলেন? ৫. কমলাকান্তের বেশভূষা কি রকম ছিল?

জাপান ঃ ১. কোবে বন্দরটি কোথায়? কোন্ তারিখে লেখকের জাহাজটি ওখানে পৌছল? ২. জাপানের রাস্তায় বেরোলে কোন জিনিসটি চোখে দেখার মতো? ৩. জাপানে সংক্ষিপ্ত কাব্য কত লাইনে রচিত হয়? ৪. জাপানে গৃহসজ্জায় কি কি জিনিস ব্যবহৃত হয়?

বহুরূপী ঃ ১. "বাবা, বাঘ নয়, সে একটা মস্ত ভালুক"—একথা কে কখন বলেছিল? ২. 'সে দিনটা আমার খুব মনে পড়ে'—কে একথা বলেছিল? 'সে দিনটা' মনে পড়ার কারণ কি? ৩. 'দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে মেয়েরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে এ ডাকাত ছেলেটির পানে চাহিয়া দুর্গানাম জপিতে লাগিল'—'ডাকাত ছেলেটি' কে? তার ডাকাতেপনার কি পরিচয় জানো? ৪. 'ছিনাথের' বাঘ সেজে আসার কারণ কি? ৫. 'ছিনাথের' ল্যাজ কাটা হয়েছিল কার হুকুমে?

নিউটনের কীর্তি ঃ ১. নিউটন কে ছিলেন? তিনি কোন্ দেশে জন্মেছিলেন। নিউটনের পুরো নাম কি? ২. গালিলিও কে ছিলেন এবং তার সম্পুর্ণ নাম কি? গালিলিও কোন সালে মারা যান? সে বছর কোন্ বিজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেন? ৩. কোনো জিনিস ওপর থেকে পড়লে তা পৃথিবীতে নেমে আসে কেন? ৪. নিউটন কি আবিষ্কার করেছিলেন?

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ঃ ১. 'তখন দেশের দারুণ দুর্দিন'—আচার্য 'দুর্দিন' বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন? এবং এর প্রতিকারে আচার্যের প্রতিবিধান কি ছিল? ২. আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ঔষধ শিল্পপ্রতিষ্ঠানটির নাম বলো?

গ্রাম্য পাঠশালা : ১. 'গ্রাম্য পাঠশালা' গল্পটির গুরুমহাশয়ের নাম কি? তার শিক্ষাদানের প্রধান উপকরণ কি ছিল? ২. 'হাসচো কেন খোকা, এটা কি নাট্যশালা?' কে, কাকে, কখন একথা বলেছিলেন। নাট্যশালা কাকে বলে? ৩. 'হু, এসব হচ্ছে কি শ্লেটে'—কে, কাকে একথা বলেছিল এবং শ্লেটে কি করেছিল? ৪. পড়াশুনার চেয়ে গল্প শোনা অপুর ভাল লাগতো কেন? কোন্ গল্প অপুকে বেশি আকর্ষণ করতো।

বাতাপি রাক্ষস : ১. বাতাপি রাক্ষস কোন্ বনে বাস করতো এবং তার ভাইয়ের নাম কি ছিল? ২. দণ্ডক অরণ্যে আর কারা বাস করতো? তারা সারাদিন কি করতো? ৩. গাছের বাতাপি নেবু শেষ হলে পরে রাক্ষসেরা কি করতো? ৪. 'আয়রে বাতাপি বাহিরে আয়' কে কাকে কেন একথা বলেছিল?' ৫. অগস্ত্য ঋষি কিভাবে রাক্ষসদের জব্দ করেছিলেন?

দেশাত্মবোধ : ১. 'প্রায় দুই বৎসর হইতে চলিল আমি বিনা বিচারে ও বিনা অপরাধে কারারুদ্ধ'—কে একথা বলেছেন, তিনি কাকে কখন একথা বলছেন? ২. 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে'—স্বপ্ন দিয়ে তৈরি কি জিনিস, বক্তা কে, সেই জিনিসটি স্বপ্ন দিয়ে তৈরি মনে হল কেন?

এভারেস্ট বিজয় : ১. এভারেস্ট অভিযানে যে তেরো জন অভিযাত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদের নাম কি? তারা কোন্ দেশের লোক? ২. এই অভিযানের উদ্যোক্তা কারা এবং অভিযানের যাত্রা শুরু কোথা থেকে? ৩. থায়াংবকে কি আছে? সেখানে কি হয় এবং অভিযাত্রীরা সেখানে কি করেছিল? ৪. প্রথমে এভারেস্ট শৃঙ্গে কে উঠেছিলেন? চূড়োয় উঠে তিনি কি করেছিলেন?

বিষ্ণুর চারি অংশে প্রকাশ : ১. কবিতাটির শেষ আট পংক্তি মুখস্থ বল? ২. কবিতাটি কোন মহাকাব্য থেকে গৃহীত? ৩. নারায়ণ কি কি নামে চারি অংশে প্রকাশিত হলেন?

আরুনি : আরুনি যে গুরুগৃহে শিক্ষালাভের জন্য ছিলেন সেই স্থানটির নাম বলো? ২. গুরু আজ্ঞাটি কি ছিল? সেই আজ্ঞা পালনের জন্য আরুনি কি কি করেছিল?

রসাল ও স্বর্ণলতিকা : ১. কবিতাটির লেখক কে? তিনি এই কবিতার মধ্য দিয়ে কি শিক্ষা দিতে চেয়েছেন? ২. 'ধন্য মোর জনম সংসারে' —একথা কে কাকে বলেছিল? এবং এর পরিণতি কি হয়েছিল?

লুকোচুরি : ১. লুকোচুরি কবিতাটির প্রথম ১০ লাইন মুখস্থ বলো।

সবার আমি ছাত্র : ১. প্রকৃতির কাছে কি কি শিক্ষণীয় আছে? ২. কবিতাটি মুখস্থ বলো? ৩. নদীর কাছে কি কি শিক্ষা লাভ করা যায়?

কাজলাদিদি : ১. খোকার চোখে ঘুম নেই কেন? ২. খোকার কথায় যে পরিবেশ-চিত্র প্রকাশিত হয়েছে তার বর্ণনা দাও।

পাছে লোকে কিছু বলে : ১. কবিতাটি কে রচনা করেছেন? তিনি আসলে কোন্ দুর্বলতা সম্বন্ধে আমাদের সাবধান করেছেন?

দেশ : ১. আমাদের দেশ 'মধুর চেয়েও মধুর'—কেন? ২. কবিতাটি মুখস্থ বলো। ৩. কার 'গোপন কোষে' অন্ন-পাণি সঞ্চিত রয়েছে?

ঘুমহারা : ১. খোকার চোখে ঘুম নেই কেন?

কামনা : ১. কবি দেবতাদের কাছে কি কামনা করছেন?

তেজস্বী পরাণ : ১. কবিতাটি কার রচনা? কবির সঙ্গে আত্মীয়তা রয়েছে এমন একজন প্রথিতযশা কবির নাম বল। ২. কবির দু'খানি প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম বল? ৩. কবি কবিতাটিতে কি আকাঙ্ক্ষা করেছেন?

কমলাকান্তের দপ্তর : স্থিরতা—অচঞ্চল, নিশ্চল (স্থির থাকা), বিশেষ্য. বিশেষণে স্থির। এমত—এমন, এইরূপ (অপ্রচলিত শব্দ)। অর্থোপার্জন—ধন, সম্পত্তি, ঐশ্বর্য বা টাকা আয় (বিশেষ্য)। দস্তখত—স্বাক্ষর বা সই (ফারসী শব্দ দস্তখৎ)। বিদ্বান্—পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, জ্ঞানী। স্ত্রীলিঙ্গে বিদূষী। গণ্ডমূর্খ—একেবারে নির্বোধ। কেরানীগিরি—লেখক, কর্মচারীবিশেষের কাজ। আপিস—অফিস-এর চলিত বিকৃত রূপ (office)। সেক্ষপীয়র—এলিজাবেথীয় যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার উইলিয়াম সেক্সপীয়র (William Shakespear, 1564—1676)। রচিত গ্রন্থাবলী—হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, জুলিয়াস সিজার, মার্চেণ্ট অফ ভেনিস, ওথেলো ইত্যাদি। দার-পরিগ্রহ—বিবাহ। অন্ন—ভাত, খাদ্যদ্রব্য। ভরি—সোনা-রুপোর ওজন বিশেষ। স্থায়ী—স্থিতিশীল, স্থানান্তরে যায় না এমন। নাগাফকির—উলঙ্গ সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় বিশেষ। ব্রহ্মচারী—ব্রহ্মচর্য পালনকারী, উপনয়নান্তে গুরুগৃহে অধ্যয়ন রত ব্রাহ্মণকুমার। দপ্তর—কার্যালয় অফিস, কাছারি। (ফরাসী শব্দ দফ্‌তর্)। মসী—লিখিবার কালি। বখ্‌শিশ—পুরস্কার (ফরাসী শব্দ বখ্‌শীশ)। লোকহিতৈষিতা—মনুষ্যজাতির কল্যাণকামী। পীড়িত—ব্যাধিগ্রস্ত। প্রবৃত্ত—নিযুক্ত, রত, আরব্ধ। জীর্ণ—অতি পুরাতন ও ছিন্নভিন্ন।

জাপান : বিরাম—অবসান, বিরতি, বিশ্রাম। বন্দর—সমুদ্র বা বড় নদীর তীরে জাহাজাদি ভিড়াইবার স্থান, Port (ফরাসী শব্দ)। দ্বীপ—চারিদিকে জলবেষ্টিত স্থলভাগ। উপক্রম—উদ্যোগ, চেষ্টা। বাইসিকল—পদচালিত দুই চাকার যান বিশেষ bicycle। মোটর—হাওয়া-গাড়ি, motor car। অনাবশ্যক—অপ্রয়োজনীয়। সহিষ্ণুতা—সহনশীলতা ধৈর্যশীলতা (বিশেষ্য)। স্বজাতীয়—নিজের জাতির অন্তর্ভূক্ত, স্বজাতিসংক্রান্ত। সাধনা—ঈপ্সিত বস্তু লাভের জন্য বা উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য প্রযত্ন। সংযত—নিবৃত্ত, নিয়ন্ত্রিত। সংক্ষিপ্ত—সংক্ষেপ করা হইয়াছে এমন, হ্রস্বীকৃত। হৃদয়—

মন, অন্তঃকরণ, চিত্ত। ঝরণা—নির্ঝর, ফোয়ারা। সরোবর—দিঘি, বড়পুকুর, পদ্মাদিযুক্ত পুষ্করিণী। স্তব্ধ—নিস্পন্দ, নিশ্চল। নৈপুণ্য—নিপুণতা দক্ষতা, পটুতা। যোদ্ধা—সৈনিক, যুদ্ধকারী। অবকাশকালে—বিরামকালে, অবসর সময়ে। রণ দক্ষতা—সমর নিপুণতা।

সৌন্দর্য—রূপ, শোভা, সুন্দরতা, মনোহারিতা। অনুভূতি—উপলব্ধি অনুভব, সুখ-দুঃখের বোধ, feeling। সৌখীন—শখযুক্ত, বিলাসী, রুচিসম্পন্ন। গম্‌গম্—গম্ভীর শব্দে শব্দিত বা ভরপুর হওয়ার ভাবপ্রকাশ। যথার্থ—প্রকৃত, খাঁটি, সত্য। বিরলতা—অনিবিড়তা, স্বল্পতা। অবকাশ—বিরাম, ফুরসত, অবসর, ছুটি, ফাঁক। সর্বজনীন—সকলের জন্য কৃত অনুষ্ঠিত বা উদ্দিষ্ট; বারোয়ারি। আত্মসমর্পণ—সম্পূর্ণরূপে অন্যের বশ্যতা স্বীকার। অকর্মণ্য—অকেজো, অক্ষম, অব্যবহার্য। উদাসীন—নিরপেক্ষ, নিঃসম্পর্ক, অনাসক্ত। মিতাচার—সংযত ব্যবহার।

বহুরূপী : অবিশ্রান্ত—অশ্রান্ত, অক্লান্ত। সমাচ্ছন্ন—সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন বা আবৃত, অভিভূত। তত্ত্বাবধান—পরিচালনা বা খোঁজখবর লওয়া, অধ্যক্ষতা, রক্ষণাবেক্ষণ। অকস্মাৎ—হঠাৎ, সহসা, অতর্কিতভাবে, অকারণ। বিদ্যুৎবেগে—তড়িৎগতিতে। সেজ—কাচের আবরণীর মধ্যে অবস্থিত দীপ। দক্ষযজ্ঞ—প্রজাপতি দক্ষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞ উপযুক্ত নায়ক-অভাবে প্রলয়কাণ্ড, হট্টগোল। দেউড়ি—প্রধান প্রবেশদ্বার, তোরণ, বহির্দ্বার। সিপাহী—সৈনিক, অস্ত্রধারী রক্ষী বা প্রহরী। উত্তেজিত—উদ্দীপিত, উত্তেজনাপ্রাপ্ত। রুদ্ধনিঃশ্বাস—ত্বরাবিস্ময়াদির আধিক্যহেতু শ্বাস ফেলিতেও অক্ষম। দুর্গানাম—বিপদউদ্ধারকল্পে দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গানাম স্মরণ। বহুরূপী—নানা রূপ বা মূর্তি ধারণকারী। নারদ—দেবর্ষি বিশেষ (কলহ সঙ্ঘটক বলিয়া খ্যাত)। মহামারী কাণ্ড—সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার, হৈচৈপূর্ণ ব্যাপার। উত্তরোত্তর—পরপর, ক্রমশঃ (সন্ধি—উত্তর+উত্তর)।

নিউটনের কীর্তি : নিউটন—স্যার আইজাক নিউটন (Sir Isaac Newton, 1642—1721) ইংল্যাণ্ডের উলস্‌থরপ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। গালিলিও—গালিলিও গালিলি (Galileo

Galilei, 1564—1642) ইতালির জ্যোতির্বিদ এবং পদার্থবিদ। তিনি টেলিস্কোপ আবিষ্কার করিয়া কোপার্নিকাসের (Nciolas Copernicus, 1473—1543) সৌরতত্ত্বের সারবত্তা প্রমাণ করেন। এই আবিষ্কার প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বিরোধী বলিয়া চার্চের নির্দেশে অভিযুক্ত হন। পেণ্ডুলম—ঘড়ির দোলক (Pendulum)। মাধ্যাকর্ষণ—জড়পদার্থের পরস্পর আকর্ষণশক্তি যাহার ফলে পৃথিবীর সমাপ্ত প্রাণী ও পদার্থ পৃথিবীপৃষ্ঠে স্থির থাকে এবং পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়, অভিকর্ষ, মহাকর্ষ (Law of Gravitation)। আবিষ্কার—অপ্রকাশিত বা অজ্ঞাত বস্তু অথবা বিষয়ের সন্ধানলাভ কিংবা প্রকাশকরণ; উদ্ভাবন। তত্ত্ব—দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত, theory। স্থূল—মোটামুটি গ্রাহ্য, সাধারণভাবে গ্রহণীয়। ক্রোশ—৮০০০ হাত বা দুই মাইলের কিছু অধিক দীর্ঘ পথ-পরিমাণ। সহস্রাংশ—সহস্র বা হাজার সংখ্যার এক ভাগ। বেষ্টন—প্রাচীর, বেড়া, প্রদক্ষিণ, বেড়। স্বস্থান—নিজের জন্য নির্দিষ্ট স্থান; স্বীয় বাসস্থান।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ঃ দুর্দিন—অশুভ সময়, বিপদের দিন। বেকার কর্মহীন, জীবিকাহীন; সম্প্রদায়—দল, সমাজ, গোষ্ঠী, সঙ্ঘ। সংগ্রামবিমুখ—যুদ্ধ স্পৃহাহীন। পরমুখাপেক্ষী—পরের উপর ভরসা, অন্যের অনুগ্রহের বা সাহায্যের প্রত্যাশী। অসহায়—নিঃসহায়; একক, নিঃসঙ্গ। আন্দোলিত—আলোড়ন, বিক্ষোভ করা হইয়াছে এমন। স্বাবলম্বী—আত্মনির্ভরশীল। ব্যাহত—বাধাপ্রাপ্ত। অন্তর্দৃষ্টি—সূক্ষ্মদর্শন শক্তি। পুঞ্জীভূত—জমিয়া উঠিয়াছে এমন, সঞ্চিত, রাশীভূত। সংস্কৃতি—অনুশীলন দ্বারা লব্ধ বিদ্যাবুদ্ধি রীতি-নীতি ইত্যাদির উৎকর্ষ, সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ, কৃষ্টি, Culture। সঞ্জীবনী—প্রাণসঞ্চার কারিণী। অভিসিক্ত—নিযুক্ত, অভিষেক করা হইয়াছে এমন। উত্তরীয়—উড়ানি। জ্ঞানতপস্বী—তত্ত্বজ্ঞ। নিরলস—আলস্যহীন। অলৌকিক—মনুষ্যের পক্ষে বা মনুষ্যলোকে অসম্ভব, যাহা পৃথিবীর নয় এমন, লোকাতীত। তন্দ্রাচ্ছন্ন—নিদ্রার আবেশে আচ্ছন্ন। প্রলেপন—প্রকৃষ্টরূপে লেপন। অস্পৃশ্য—ছোঁয়ার অযোগ্য, অশুচি। পঙ্গু—খোঁড়া, বিকলপদ, চলচ্ছক্তিহীন।

গ্রাম্য পাঠশালা : অভিভাবক—রক্ষণাবেক্ষণকারী, তত্ত্বাবধায়ক, Guardian। দুর্ঘটনা—অমঙ্গলকর বা ক্ষতিকর ঘটনা ; আকস্মিক বিপৎপাত। সৈন্ধব লবণ—পাথরের ন্যায় খনিজ লবণ বিশেষ, rock salt। পাততাড়ি—কাগজের পরিবর্তে ব্যবহারের জন্য প্রধানত তালগাছের পাতার আটি। উপকরণ—জিনিস। বেপরোয়া—কোনরূপ সাবধান না হইয়া। ঢ্যারা—কাটা দাগ, ক্রশ চিহ্ন, '×'। শ্যেনদৃষ্টি—বাজপাখির ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। হাজির—উপস্থিত। অপ্রসন্ন—অখুশি। আড়ষ্ট - নড়াচড়া বন্ধ। কার্পেট—এক ধরনের পুরু ঘন বুননির শক্ত কাপড়, Carpet। অপরাহ্ণ—বিকাল। নেতি—ন্যাকড়া, কাপড়ের টুকরো। বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস—এটি একটি সংস্কৃত প্রবাদের বাংলা। প্রবাদটি এইরূপ—'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ'। অর্থাৎ ব্যবসা—বাণিজ্য থেকেই অর্থলাভ সম্ভব। দাশু রায়—সম্পূর্ণ নাম দাশরথি রায় ; পাঁচালীকার হিসাবে বিখ্যাত। বর্ধমান জেলার বাঁধমুড়ি গ্রামে দাশরথি রায়ের জন্ম ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে। পিতার নাম দেবীপ্রসাদ রায়। দাশরথির গানে অনপ্রাসের ঝঙ্কার ও সুরের লালিত্য ছিল। ইনি আগমনী ও বিজয়া বিষয়েও গান রচনা করেন। ১৮৭৫ সালে কবির দেহান্ত হয়।

বাতাপি রাক্ষস : অরণ্য—বন, জঙ্গল। আশ্রম—তপোবন, সংসার-ত্যাগীদের আবাস। সাধনার বা শাস্ত্রচর্চার স্থান, মঠ। তপস্বী—যিনি সংসার ত্যাগ পূর্বক অরণ্যবাসী হইয়া কঠোর নিয়মে দেবতার আরাধনা করেন, তাপস, মুনি, যোগী। ভ্রমর—অলি, মৌমাছি। পরামর্শ- মন্ত্রনা, যুক্তি ; কর্তব্য সম্বন্ধে অভিমত, উপদেশ। শ্মশান—শবদাহস্থান। শোক—প্রিয় ব্যক্তি বস্তু প্রভৃতিকে হারাইবার ফলে মানসিক যন্ত্রণা বা দুঃখ। ভস্ম—ছাই।

দেশাত্মবোধ : কারারুদ্ধ—জেলে আটক। গবর্ণমেণ্ট—সরকার, Government। আদালত—বিচারালয়, Court (আরবী শব্দ)। কর্তৃপক্ষ—শাসকবর্গ, কার্যসম্পাদকগণ। অভিযোগ—নালিশ, দোষারোপ। সাক্ষ্য—সাক্ষীর কর্ম, আদালতে প্রদত্ত ঘটনাদির প্রত্যক্ষ বর্ণনা। জনান্তিকে—লোকের সামীপ্যে, একপার্শ্বে। সনাতন—শাশ্বত, নিত্য। চিরবর্তমান, বহু-কাল—প্রচলিত (সনাতন প্রথা)। দেশান্তরিত—বিদেশগত, স্বদেশত্যাগী।

মোহনীয়—মুগ্ধকর। আত্মোৎসর্গ—স্বীয় জীবন বা স্বার্থ বিসর্জন। বিচ্ছেদ—বিয়োগ, বিরহ, ছাড়াছাড়ি। পরমশমণি—কাল্পনিক প্রস্তর বিশেষ যাহার স্পর্শে লৌহ স্বর্ণে পরিণত হয়। মূর্ত—মূর্তিযুক্ত, আকার বা শরীর ধারণ করিয়াছে এমন। ব্রত - সংযম, পুণ্যলাভ ইষ্টলাভ পাপক্ষয় প্রভৃতির জন্য অনুষ্ঠিত ধর্মকার্য। উদ্‌যাপন—ব্রত-সমাধান, সম্পাদন, সমাপন, নির্বাহ। কৃতাঞ্জলিপুটে—দুই হাত একত্র করিয়া, হাতজোড় করিয়া। স্বরাজ—স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীনতা। প্রচেষ্টা—বিশেষভাবে চেষ্টা, প্রয়াস, সাধনা। তপ—তপস্যা। স্বাধ্যায়—বেদপাঠ, বেদাধ্যয়ন। চিরন্তন—চিরকালীন, চিরকাল্যব্যাপী। কণ্টকময়—কণ্টকপূর্ণ। দীক্ষা—তত্ত্বজ্ঞান বা মুক্তিলাভের জন্য মন্ত্রোপদেশ।

এভারেষ্ট বিজয়ঃ নির্ধারিত—নির্ণয় বা নির্ধারণ করা হইয়াছে এমন। এভারেস্ট—পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ, Mount Everest। হিমালয় পর্বতের কোলে নেপালে অবস্থিত মাউণ্ট এভারেস্ট-এর উচ্চতা ২৯,১৭১ ফুট। কাঠমাণ্ডু -নেপালের রাজধানী। অভিযাত্রী—দেশাবিষ্কার ইত্যাদির উদ্দেশ্যে দুঃসাহসী পর্যটক। অ্যামবাসি—দূতাবাস, Embassy। ভারবাহী—বোঝা বহনকারী। স্বয়ং—আপনি, নিজে। পাউণ্ড—প্রায় ৪৫৪ গ্রাম ওজন, ইংল্যাণ্ডের মুদ্রাবিশেষ, pound। দুর্গম—গমন করা দুঃসাধ্য। তুষার—বরফ। ইষ্ট—উপাস্য। আরাধনা—উপাসনা, পূজা, প্রার্থনা। বৌদ্ধমঠ—বুদ্ধমতাবলম্বীদের উপাসনালয়। সুইস—সুইটজারল্যাণ্ড দেশীয়, Switzerland। হিমবাহ—পর্বতগাত্র বাহিয়া নিম্নদিকে ধীরে প্রবাহমান তুষারস্তূপ, Glacier। অক্সিজেন—অম্লজান, Oxygen। দুর্জয়—অজেয়, জয় করা শক্ত এমন। পর্যাপ্ত—প্রচুর, যথেষ্ট, প্রয়োজন মিটাইবার উপযুক্ত। অবিশ্রান্ত—অক্লান্ত, অবিরাম। নতজানু—হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছে এমন। অর্ঘ্য—পূজা। পদার্পণ—চরণস্থাপন, উপস্থিত হওয়া। স্মরণ—ধ্যান।

বিষ্ণুর চারি অংশে প্রকাশঃ গোলোক—বৈকুণ্ঠ, বিষ্ণুলোক, স্বর্গ নারায়ণের বাসস্থান। গদাধর—গদা যাঁহার প্রহরণ অর্থাৎ বিষ্ণু। সুচারু—অতিসুন্দর। কল্পতরু—সর্বকামনাপূরণকারী দিব্যবৃক্ষ। নেতপাট—সূক্ষ্ম পট্ট

বস্ত্রবিশেষ। বনমালী—শ্রীকৃষ্ণ। অভিলাষ—বাসনা, ইচ্ছা, স্পৃহা। স্বর্ণছত্র—সোনার ছাতা, আতপত্র। চামর—চামরী গোরুর পুচ্ছ নির্মিত ব্যাজন। স্তব—স্তুতি, মাহাত্ম্যকীর্তন। মুনিবর—তপস্বী, ঋষি, যোগী। উত্তরিলা—পৌঁছিল। বিদ্যমান—বর্তমান, অস্তিত্বশীল, উপস্থিত। বিহ্বল—অভিভূত, বিবেক, অচেতন, আত্মহারা। তিতিল—ভিজিল, সিক্ত হইল। নয়ন—আঁখি, চক্ষু।

আরুণী : দ্বিজ—ব্রাহ্মণ (একবার মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম এবং পুনরায় উপনয়নাদি সংস্কাররূপ নবজন্ম লাভ হয়)। শিষ্য—ছাত্র, চেলা; নির্দিষ্ট কাহারও মতাবলম্বী ব্যক্তি, ভক্ত। অধ্যয়ন—গভীর মনোযোগের সহিত পাঠ; শাস্ত্রালোচনা। আজ্ঞা—আদেশ। কৈল—করিল। ধান্যক্ষেত্রে—ধানক্ষেতে। আলি—আইল, জমির বাঁধ। যতন—যত্ন। দন্ত—দাঁত। নারিল—সক্ষম হইল না। বন্ধন—আটকান। ক্রোধ—রাগ। রজনী—রাত। আপনি—নিজে স্বয়ং। প্রণমিল—প্রণাম করিল। আশিস্—আশীর্বাদ; গুরুজন কর্তৃক শুভেচ্ছাপ্রকাশ। কল্যাণ—হিত, মঙ্গল, কুশল। চারিবেদ—চতুর্বেদ ঋক্, সাম, যজুঃ ও অর্থর্ব। ষট্‌শাস্ত্র—ষড়্‌দর্শন, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, বৈশেষিক ও বেদান্ত—এই ছয়খানি দর্শন শাস্ত্র।

রসাল ও স্বর্ণলতিকা : রসাল—আমগাছ। স্বর্ণলতিকা—স্বর্ণলতা নামক একজাতীয় লতাবিশেষ। ধনি—কাব্যে রমণীকে সম্বোধনকালে ব্যবহৃত। নিন্দ—নিন্দা কর। বিধাতা—বিধানকর্তা ('ভারতভাগ্যবিধাতা' : রবীন্দ্র)। নিদারুণ—কঠোর, একান্ত অসহ্য। তেঁই—তাই, তজ্জন্য। কায়া—দেহ, শরীর। সৃজিল—সৃষ্টি করিল। মলয়—বাতাস। মধুকর—ভ্রমর, মৌমাছি। হিমাদ্রি—হিমালয় পর্বতশ্রেণী। সদৃশ—অনুরূপ, তুল্য। তপন—সূর্য। তাপণ—তাপজনন, তাপ প্রয়োগ। বিরাম—বিশ্রাম। লভয়ে—লাভ করে। অনুক্ষণ—সর্বদা ভুঞ্জে—ভোগ করে, ভোজন করে। পথগামী—সড়ক বা পথ দিয়া গমনরত। ললনে—কাব্যে নারীকে সম্বোধনকালে ব্যবহৃত। ভুবন—পৃথিবী। আগার, গৃহ, আধার। বিধুমুখি—চাঁদের ন্যায় সুন্দর মুখ বিশিষ্ট। নীরবিলা—নীরব বা মৌন রহিল। তরুরাজ—বৃক্ষশ্রেষ্ঠ। স্বননে—শব্দে,

ধ্বনিতে। প্রভঞ্জন—ঝড়, প্রবল বায়ু। সিংহনাদ—সিংহের গর্জন। ঘন—প্রবল। ভীম—ভয়ঙ্কর। ভীমসেন—মধ্যম পাণ্ডব। নীচশির—যে মাথা নিচু করিয়া আছে।

লুকোচুরি ঃ 'পরে—উপরে। নয়ন—আঁখি, চক্ষু। মহাভারত—বেদব্যাস-রচিত কুরুপাণ্ডবের কাহিনী-বিষয়ক শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। প্রদীপ—দীপ, বাতি, আলো। গোয়াল—গোশালা, গাভীগৃহ। ভুঁয়ে—মাটিতে, ভূমিতে।

সবার আমি ছাত্র ঃ আকাশ - গগণ, অন্তরীক্ষ, শূন্য। উদার—মহৎ, উচ্চ, প্রশস্ত। কর্মী—কর্মদক্ষ, কর্মক্ষম। মন্ত্র—পবিত্র শব্দ বা বাক্য দ্বারা উচ্চারণপূর্বক দেবতার উপাসনা করা হয়। যাহা মনন করিলে ত্রান পাওয়া পাওয়া যায়। মৌন—বাকসংযম, তূষ্ণীভাব, নীরবতা। দিল-খোলা—অকপট, মন-খোলা, মহানুভব। মন্ত্রনা—পরামর্শ, কর্তব্য সম্বন্ধে অন্যের সহিত আলোচনা। মেদুর—স্নিগ্ধ, মসৃণ, চিক্কণ, শ্যামল। ইঙ্গিত—ইশারা, সঙ্কেত। সহিষ্ণুতা—ক্ষমাশীলতা, সহনশীলতা। পাষাণ—পাথর, নিষ্ঠুর ব্যক্তি। দীক্ষা—তত্ত্বজ্ঞান বা মুক্তিলাভের নিমিত্ত মন্ত্রোপদেশ। ঝরণা—নির্ঝর, ফোয়ারা। শ্যাম-বনানী—সবুজ অরণ্য। সরসতা—রসপূর্ণতা, মধুরত্ব। ভিক্ষা—দান, দানরূপে প্রদত্ত বস্তু। কৌতূহল—নূতন বা অজ্ঞাত বিষয়ে আগ্রহ, ঔৎসুক্য।

কাজলাদিদি ঃ শোলোক—শ্লোক, কবিতায় বা কাব্যে ব্যবহৃত। জোনাই—জোনাকি। আচল—অঞ্চল, শাড়ীর প্রান্তভাগ।

পাছে লোকে কিছু বলে ঃ লাজ—লজ্জার কোমল ও কথ্য রূপ। সদা- সর্বদা। নীরবে—নিঃশব্দে। বুদবুদ—জলবিম্ব, জলের ভুড়ভুড়ি। শুভ্র—সাদা, নির্মল। হৃদয়—বক্ষস্থল, মন, অন্তকরণ, চিত্ত। শুষ্ক—শুকনা। নিরমল—নির্মল (পদ্যে ব্যবহৃত)। প্রশমিতে—প্রশমন করিতে বা শান্ত করিতে, নিবৃত্ত করিতে। উপেক্ষা—অগ্রাহ্য বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা। ম্রিয়মান—বিষন্ন, মরণাপন্ন।

দেশ ঃ মধুর—অতিশয় মিষ্ট বা মনোহর। চন্দন—সুগন্ধ কাষ্ঠ বিশেষ বা তাহার গাছ। শীতল—ঠাণ্ডা, হিমযুক্ত। ক্লান্তি-হরা, —শ্রান্তি বা

অবসন্নতা দূর হয়। অঙ্গ—অবয়ব, শরীরের অংশ, Limb। শীতল পাটি—শীতল ও মসৃণ মাদুর বিশেষ। শিয়রে—শয়নকারীর শীর্ষদেশ বা মাথার দিক। জ্যোৎস্না—চন্দ্রালোক, জোছনা। নিতি—নিত্য, রোজ, প্রত্যহ। নাগের—সর্পের, সাপের। মউল—মহুয়া। কোষে—ভাণ্ডারে। অন্ন-পাণি—ভাত, খাদ্রদ্রব্য এবং জল। যোগায়—সরবরাহ করে। কনক ধানে—সোনালী রঙের ধানে।

ঘুমহারা ঃ বজ্জাত—দুষ্ট, বদমাশ, দুর্বৃত্ত। কস্‌নে—কেন কহিতেছ না (গ্রাম্য রূপ)। আগল—অর্গল, খিল। বকতে—অধিক কথা বলিতে। মেলা—বহু, অনেক। আড়ি—অসদ্ভব, বিবাদ। জোনাক—জোনাকি, খদ্যোৎ, জোনাই।

কামনা ঃ মোর—আমার, মম। দেবতা—ঈশ্বর। প্রভু—ঈশ্বর, স্বামী। চিত্ত—মন, হৃদয়, অন্তঃকরণ। মহিমা—গৌরব, মাহাত্ম্য। হিয়া—হৃদয়ের কোমল রূপ। দারিদ্র্য—দরিদ্র অবস্থা, অভাব, দীনতা। অত্যাচার—দুর্ব্যবহার, উৎপীড়ন। ভুবন—পৃথিবী। আবর্জনা—জঞ্জাল, সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয় ময়লা। মার্জনা—ক্ষমা।

তেজস্বী পরাণ ঃ বীরত্ব—রণকুশলী, বলবান ও সাহসী। তেজস্বী—বিক্রমশালী, তেজোময়। পরাণ—প্রাণ। তোষামোদ—খোসামোদ, মনোরঞ্জন। ব্যথা—বেদনা। হিয়ারে—হৃদয়কে বা মনকে। মহৎ—শ্রেষ্ঠ। শক্তি—ক্ষমতা। মানবে—মানুষকে। বরিতে—বরণ বা আহ্বাহন করিতে। ভ্রাতা—ভাই। সম—সমান। শত্রু—অরাতি। মিত্র—বন্ধু। ভেদাভেদ—পার্থক্য। হিংসা—দ্বেষ।
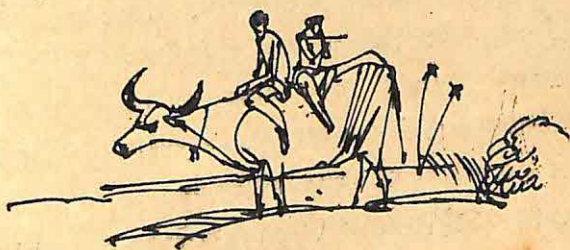
লেখক-কবি জীবনকাহিনী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জন্ম: জুন ২৬, ১৮৩৮, মৃত্যু : এপ্রিল ৮, ১৮৯৪): নিবাস কাঁঠালপাড়া, চব্বিশ পরগণা। পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র এবং যদুনাথ বসু প্রথম বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ডেপুটি ম্যাজিস্টেট পদে নিযুক্ত হন। ছাত্রাবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সম্বাদ প্রভাকরে' পদ্য লিখিতেন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে তাহার সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। তাহার রচিত উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' 'মৃণালিনী,' 'বিষবৃক্ষ,' 'চন্দ্রশেখর,' 'রজনী,' 'কৃষ্ণকান্তের উইল ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (জন্ম : মে ৭, ১৮৬১ ; মৃত্যু অগস্ট ৭, ১৯৪১): নিবাস জোড়াসাঁকো, কলিকাতা, পরে শান্তিনিকেতন, বীরভূম। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহন রায়ের বন্ধু প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র। স্কুল-কলেজের শিক্ষা রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নাই বটে কিন্তু তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ও তীক্ষ্ণ মনীষা বহু অধ্যয়নে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। গল্প, উপন্যাস, ব্যঙ্গ, কৌতুক, দিনলিপি, ভ্রমণ-কাহিনী, ধর্মোপদেশ, শিক্ষা, রাজনীতি, শব্দ, ছন্দ, ভাষাতত্ত্ব, বিজ্ঞান, নাটক, গদ্য কবিতা। রূপক নাটক, প্রহসন, কবিতা, গান প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে 'গীতাঞ্জলি' কাব্য গ্রন্থের জন্য তিনি সাহিত্যে 'নোবেল প্রাইজ' লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি পৃথিবীর নানা দেশ হইতে এবং স্বদেশের বহু সম্মানে বিভূষিত হন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জন্ম : সেপ্টেম্বর ১৫, ১৮৭৬ ; মৃত্যু :

জানুআরি ১৬, ১৯৩৮) ঃ নিবাস দেবানন্দপুর, হুগলী। ভাগলপুরে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন, প্রথম জীবনে ব্রহ্মদেশে চাকুরী করিতেন, পরে সাহিত্য-সাধনাতেই সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বহু উপন্যাস গ্রন্থের রচয়িতা—'বড়দিদি', 'বিরাজ বৌ', 'বিন্দুর ছেলে', 'পল্লীসমাজ', 'দেনা-পাওনা', 'দেবদাস', 'পণ্ডিতমশাই', 'চন্দ্রনাথ', 'শ্রীকান্ত', 'বিপ্রদাস', 'অরক্ষণীয়া', 'পথের দাবী', 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'শেষ প্রশ্ন', প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'নারীর মূল্য', 'স্বদেশ ও সাহিত্য' তাহার রচিত প্রবন্ধ পুস্তক।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (জন্ম: অগস্ট ২০, ১৮৬৪ ; মৃত্যু : জুন ৬, ১৯১৯) ঃ নিঃবাস জেমো, মুর্শিদাবাদ। পিতার নাম গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী। এম.এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানে (পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র) প্রথম স্থান অধিকার করেন। রামেন্দ্রসুন্দর 'প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ' বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। প্রথমে রিপন কলেজের অধ্যাপক এবং পরে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার রচিত গ্রন্থ 'প্রকৃতি', 'জিজ্ঞাসা', 'কর্মকথা', 'জগৎকথা', 'যজ্ঞকথা', 'নানাকথা', 'চরিত্রকথা', 'বিচিত্র জগৎ' প্রভৃতি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম : সেপ্টেম্বর ১২ ১৮৯৪ ; মৃত্যু : নভেম্বর ১, ১৯৫০) ঃ পিতৃনিবাস ব্যারাকপুর, বনগ্রাম মহকুমা, চব্বিশ পরগণা। বিভূতিভূষণ বি.এ পাস করিয়া শিক্ষকতা কর্মে নিযুক্ত হন। ভাগলপুরে তাঁহার 'পথের পাঁচালী' রচিত হয়। তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা 'দৃষ্টি প্রদীপ', 'আরণ্যক', 'অভিযাত্রিক', 'যাত্রা বদল', 'মৌরিফুল', প্রভৃতি।

স্যার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (জন্ম : সেপ্টেম্বর ১৪, ১৮৮৪) ঃ পিতার নাম রামচন্দ্র ঘোষ। তিনি গিরিডি বিদ্যালয়, কলিকাতা এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' বৃত্তি লাভ

করেন। ১৯১৫-২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১৪-২৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্সের ডীন ছিলেন। ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে 'স্যার' উপাধি পান। ১৯৫৪-৫৫ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (জন্ম : অগস্ট ৭, ১৮৭১ ; মৃত্যু : ডিসেম্বর ৫, ১৯৫১) : নিবাস জোড়াসাঁকো, কলিকাতা। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র, গুনেন্দ্রনাথের পুত্র। চিত্রশিল্পে অবনীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল ; পরে শিল্পী হিসাবেই তিনি পৃথিবীখ্যাত হন। 'শকুন্তলা', 'ভূতপতরীর দেশ' 'নালক', 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনী', 'পথে বিপথে', 'জোড়াসাঁকোর ধারে', 'ঘরোয়া', 'বাগেশ্বরী শিল্পী-প্রবন্ধাবলী', 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ' ইত্যাদি তাহার রচিত গ্রন্থ।

সুভাষচন্দ্র বসু (জন্ম : জানুয়ারি ২৩, ১৮৯৭) : কটকের বিখ্যাত আইনজীবী জানকীনাথ বসুর পুত্র। চব্বিশ পরগণার কোদালিয়া গ্রামে পৈত্রিক নিবাস। স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে বি.এ পাস করিয়া আই. সি. এস পরীক্ষা দিবার জন্য ইংল্যাণ্ড গমন করেন এবং ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে এই পরীক্ষায় চতুর্থস্থান অধিকার করেন। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ক্যালকাটা করপোরেশন এর প্রধান কর্মকর্তা এবং পরে মেয়র নির্বাচিত হন। ১৯৩৮ এবং ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে ত্রিপুরী ও হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি হন। পরে মতভেদ হওয়ায় সুভাষচন্দ্র ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করেন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে স্বগৃহে অন্তরীণ থাকার সময় অকস্মাৎ তিনি অন্তর্হিত হন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ছাব্বিশে জানুআরি সুভাষচন্দ্র 'আজাদহিন্দ ফৌজ' গঠন করেন। 'তরুণের স্বপ্ন', 'ভারত পথিক', তাহার দুইখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (জন্ম : জানুয়ারি ১৫, ১৯০৫) : জন্ম কলিকাতায়। কিশোর এবং শিশুদের জন্য বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা প্রায় ষাটখানি। মজার গল্প, জনক-জননী, সোনার

ভারত, অবিস্মরণীয় মুহূর্ত, এভারেষ্ট বিজয়ী তেনজিং প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ম্যাকসিম গোর্কির 'মা' এবং মুল্‌করাজ আনন্দের 'কুলী' তাহার স্বার্থক বঙ্গানুবাদ।

কৃত্তিবাস ওঝা (জন্ম আনুমানিক ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে): নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরের ফুলিয়ায় কৃত্তিবাসের জন্ম। পিতার নাম বনমালী, পিতামহ মুরারী ওঝা। একাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে কবি বিদ্যার্জনের জন্য উত্তরদেশে গমন করেন, বিদ্যাসমাপনান্তে কবি জনৈক হিন্দু রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা করেন। এই রাজা সম্ভবত রাজশাহীর রাজা গণেশ (১৪১৪—১৪১৮) কবি প্রায় আশি বৎসর কাল জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়।

কাশীরাম দাস (আবির্ভাব-কাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে): নিবাস বর্ধমান জেলার সিঙ্গি গ্রামে পিতার নাম কমলাকান্ত। কাশীরামের মহাভারত সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রচিত। প্রবাদ আছে কাশীরাম আদি, সভা, বন ও বিরাটপর্ব পর্যন্ত রচনা করিয়াছিলেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (জন্ম: জানুয়ারি ২৫, ১৮২৪; মৃত্যু: জুন ২৯, ১৮৭৩): নিবাস সাগরদাঁড়ি যশোহর। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন তৎকালীন অভিজাত ব্যক্তি। ছাত্রাবস্থায় মধুসূদন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে 'শর্মিষ্ঠা নাটক', 'কৃষ্ণকুমারী নাটক', 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য', 'মেঘনাদ বধ কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' প্রকাশিত হয়। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনা করেন।

সুনির্মল বসু (জন্ম: জুলাই ২০, ১৯০২; মৃত্যু: ১৯৫৭): গিরিডিতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় একশোটিরও বেশি গ্রন্থের রচয়িতা। দোলা, টুনটুনির গান, কিপ্টে ঠাকুর্দা, ইস্তিবিস্তির আসর, কিশোর আবৃত্তি প্রভৃতি তাহার উল্লেখযোগ্য শিশু ও কিশোর রচনা।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী (জন্ম: নভেম্বর ২৭, ১৮৭৬ মৃত্যু: ফেব্রুয়ারি ১, ১৯৪৮): নদীয়া জেলায় জমসেরপুরের বিখ্যাত জমিদারবংশে জন্ম। রবীন্দ্রোত্তর যুগের অসামান্য কবি। রেখা, লেখা, অপরাজিতা, জাগরণী, নীহারিকা, পাঞ্চজন্য, রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য প্রভৃতি তাহার রচিত কাব্য ও গদ্যগ্রন্থ।

কামিনী রায় (জন্ম : ১২, ১৮৪৬ ; মৃত্যু : সেপ্টেম্বর ২৭, ১৯৩৩) : নিবাস বরিশাল জেলার বাসণ্ডায়। পিতা চণ্ডীচরণ সেন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে বি.এ পাস করেন এবং বেথুন স্কুলে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। স্ট্যাটুটরি সিভিলিঅন কেদারনাথ রায়ের সহিত কামিনী দেবীর বিবাহ হয়। 'আলো ও ছায়া', 'মাল্য ও নির্মাল্য', 'দীপ ও ধূপ', 'অশোক সংগীত', 'জীবনপথে' প্রভৃতি তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (জন্ম : ফেব্রুয়ারি .২, ১৮৮২ ; মৃত্যু : জুন ২৫, ১৯২২) : নিবাস চূপী, বর্ধমান। পিতামহ প্রখ্যাত সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্ত, পিতা রজনীনাথ। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ছন্দরসিক কবি। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে মাত্র অষ্টাদশ বৎসর বয়স্ক কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কবিতা' প্রকাশিত হয়। আধুনিক বাংলা কবিতায় বিভিন্ন ছন্দের প্রবর্তন করিয়া 'ছন্দের যাদুকর' আখ্যায় ভূষিত হন। 'বিদেশী কবিতা' অনুবাদেও তাঁহার দক্ষতা ছিল অপরিসীম। রচিত কাব্যগ্রন্থ 'বেণু ও বীণা', 'হোমশিখা', 'তীর্থসলিল', 'ফুলের ফসল', 'কুহু ও কেকা' ইত্যাদি।

হুমায়ুন কবির : (জন্ম : ফেব্রুআরি ২২, ১৯০৬ ; মৃত্যু : ১৯৬৯)—পৈতৃক নিবাস বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত ফরিদপুর জেলায়। কলিকাতা ও অক্সফোরড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তিনি কুড়িটিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। স্বপ্ন-সাধ, সাথী, বাংলায় কাব্য, ইংলিশ পোয়েট্রি, মহাত্মা অ্যাণ্ড আদার পোয়েমস্ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

মানকুমারী বসু : (জন্ম : ১৮৬৩ ; মৃত্যু : ১৯৪৩)—যশোহর জেলায় সাগড়দাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতৃস্পুত্রী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম 'ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক' লাভ করেন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায়' জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' পুরস্কারে সম্মানিত করেন। 'কনকাঞ্জলি', 'সোনার সাথী', 'কাব্য-কুসুমাঞ্জলি' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রসিদ্ধ।